বিন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

পঞ্চম মুদ্রণ :
জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীশীতল চন্দ্র রায়
আরতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯ ডি এইচ ঘোষ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বিন্যাস

১

অনেক বছর আগের এক গরমের দুপুরবেলায় আমার ঘরে বসে বসে স্কুলের পড়া করছিলাম। এমন সময় ভেজানো দরজা কে যেন আলতো হাতে ঠেললো।

পিছন ফিরে দেখি, রাম। হাতে একটা মানি-অর্ডার ফর্ম।

আমার টেবিলের কাছে এসে অনুনয় করে বলল, লিখে দেবে দাদাবাবু?

আমি বই সরিয়ে রেখে বললাম, বল।

ও গড়গড় করে বলে গেল: দশরথ সাই। সাকিন নুয়াকোট। পুস্টাপিসো রুকুঝাকা, জ্বিলা কট্‌ৱক্ক।

পরে এই ঠিকানা আমার মুখস্থ হয়ে গেছিল। কম করে দুশো-বার আমি ঐ ঠিকানা লিখেছি মানি-অর্ডার ফর্মে। তখন তিরিশ টাকা করে পাঠাত ও প্রতি মাসে ওর বাবাকে।

আমার মানি-অর্ডার লেখা হয়ে গেলে দুপুরের খাঁ-খাঁ রোদে ও হেঁটে যেত পোস্ট অফিসের দিকে। টাকাটা পাঠিয়ে, তারপর এক খিলি অখয়েরী গুণ্ডী মোহিনী পান খেয়ে, সুপুত্রের কর্তব্য করার আনন্দে আনন্দিত হয়ে ফিরে আসত।

মানি-অর্ডার ফর্ম ভরতে ভরতে কল্পনা করতাম যে, সেই মুহূর্তে সুদূর উড়িষ্যার কোনো ছায়া-ঘেরা, ঘুঘু-ডাকা গ্রামে দাওয়ায় ঠেস দিয়ে বসে রামের বাবা দশরথ তার কোলকাতাবাসী বড় ছেলের পাঠানো কটা টাকার জন্যে চাতকের মতো প্রার্থনা করছে।

দশরথ সাই-এর কাছে তিরিশ টাকা যে অনেক টাকা।

আমি আর রাম প্রায় সমবয়সী ছিলাম। কত বয়স হয়েছে জিজ্ঞেস করলে ও বলত, যেবার নদীতে দারুণ বন্যা হয়েছিল এবং গ্রামের কারো ক্ষেতেই কলাই ফলেনি, সেবার ও জন্মেছিল।

পনেরো বছর বয়সে কি করে তার এক গ্রামের মেসোর সঙ্গে বিনা টিকিটে ভাগ্য অন্বেষণের চেষ্টায় রাম কোলকাতার হাওড়া স্টেশনে এক সকালে এসে পৌঁছেছিল, তা রামের আজ প্রায় মনেই পড়ে না। সেই গ্রামতুতো মেসোর দাদা ছিল প্লাম্বার মিস্ত্রী। ভবানীপুরের বস্তীতে তার ঘর। সেই ঘরের মাটির মেঝেতে একমুঠো মুড়ি ও কলের জল খেয়ে কোলকাতার প্রথম রাত কাটিয়েছিল ও।

তারপর এ-বাড়ি সে-বাড়ি অনেক বাড়ি ঘুরে আমাদের বাড়িতে এসে জোটে। আমাদের বাড়ি বলতে বড় মামার বাড়ি। আমার যখন আড়াই বছর বয়স তখন আমার বাবা মারা যান প্লেন ক্র্যাশে। বাবা আর্মির অফিসার ছিলেন। তারপর থেকে মার সঙ্গে বড় মামার বাড়িতেই মানুষ। বড় মামার এক ছেলে ও এক মেয়ে। কাজলদা আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়, আর রুমি আর আমি প্রায় সমবয়সী। কাজলদা আমেরিকায় আছে বহুদিন। রুমি এখন দিল্লীতে মিরাণ্ডা হাউসে পড়ে। ওখানেই থাকে হস্টেলে।

রাম প্রথম যেদিন আমাদের বাড়িতে এল সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি নীচু ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ির সামনে বিঘাখানেক জায়গাতে সবুজ লন ছিল। মামা সবে বাড়ি শেষ করেছেন। তখন লনের পরিচর্যা ও লনের চারপাশে গাছ-গাছালি লাগানো হচ্ছে। আমাদের মালীর নাম ছিল বাইধর। সে কেবলই

বলত যে, সে একা একা এত কাজ আর করে উঠতে পারছে না। তার একজন সহকারীর বিশেষ দরকার। সেই-ই একদিন রামকে নিয়ে এল।

খালি গা, পরনে গেরুয়া-মাটিতে কাচা এক ফালি গেরুয়া-রঙা খাটো ধুতি। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। উঁচু উঁচু দাঁত। কুদর্শন একটি ছেলে। চেহারায়, ব্যবহারে পুরোপুরি গ্রাম্য।

মামা ওকে প্রথম দর্শন দেখেই বললেন, এ একটি ক্লাস ওয়ান গ্রেড ওয়ান ইডিয়ট। হাফ-উইট্।

মামীমা বললেন, হাফ-উইট্ না হলে তোমার মতো লোকের কাছে মাসে তিরিশ টাকা মাইনেতে কাজ করতে আসবে কেন ?

মামা তাই শুনে বললেন, তা ঠিক। তবে বেশি চালাক লোকের দরকার নেই। চালাক হলে কখনও ভালো চাকর হয় না। একেই গড়ে-পিটে নেবো। এ এখনও কাদা আছে। একে নিজেদের মতো করে গড়ে নিতে কষ্ট হবে না।

প্রথম দিনই বাইধর মালীর সঙ্গে তার কাজে সহায়তা করছিল রাম। ও শাবল ধরেছিল, বাইধর হাতুড়ি মারছিল তার উপর। কেরালার ডোয়ার্ফ ভ্যারাইটীর নারকোল গাছ পোতা হবে বলে গর্ত করছিল ওরা লনের এক কোণায়। এমন সময় বাইধরের ভারী হাতুড়ি স্থানচ্যুত হয়ে এসে পড়ল রামের আঙুলের উপর। দুটো আঙুল থেঁতলে গেলো। যন্ত্রণায় কাৎরে উঠেই তার পরম হিতার্থী চাকরি-যোগাড় করে দেওয়া তার গ্রামতুতো মেসোর উদ্দেশ্যে রাম অশ্রাব্য গ্রামজ গালাগালির তুবড়ি ছুটিয়ে দিল আত্মবিস্মৃত হয়ে।

মামীমা এবং মামা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাগ্যে তাঁরা রামের ভাষা বুঝতেন না।

রাম তিনদিন গ্যারাজ ঘরগুলোর পাশে চাকর-বাকরদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘর দুটোর একটিতে শুয়ে রইল। ডাক্তারের দেওয়া লোশান লাগিয়ে এবং ওষুধ খেয়ে। চতুর্থ দিন থেকে ও কাজে লাগল। ওর আঙুলের কোনো হাড় বোধহয় ভেঙে গেছিল, কারণ তারপর থেকে ডান হাতে ও একেবারেই জোর পেতো না।

কিন্তু তিরিশ টাকা মাইনের চাকরের হাড় যদি নিজ প্রাণশক্তিতে জোড়া না লাগে, তাহলে লাগে না। এক্স-রে করার কথা, অর্থোপেডিক্স-এর কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা আমার মামার মতো উদার লোকের মনেও তখন আসেনি।

রামের সমবয়সী ছিলাম বলে, রাম মাঝে মাঝে আমাকে বলত, আমার ডান হাতটা চিরদিনের মতো অকেজো হয়ে গেল। বলেই, তার গ্রামতুতো মৌসাকে গালাগালি করত। তারপর বলত, সবই কপাল। গরীবের ভগবান ছাড়া আর কে আছে বল? যার কপালে যা আছে তাই-ই হয়

ও বার বার বলত, কপাল কেউই খণ্ডাতে পারে না।

সুস্থ হয়ে উঠেই, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই, দেখতে দেখতে রাম মামাবাড়ির একজন হয়ে গেল। দশাসই গ্রেটডেন কুকুর ভিকটরের দেখাশোনা, দুটো গাড়ি ধোওয়া, রাতে গেট বন্ধ-করা, চাবি দেওয়া। যতবার গাড়ি ঢুকছে বেরুচ্ছে ততবার গেট খোলা, ঘর মোছা, ফার্নিচার, দরজা জানালা সব ঝেড়ে-পুঁছে রাখা। মামা জাপান থেকে যেসব ভাস্ নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো চকচকে করে রাখা, পেতলের জিনিসে ব্রাসো দেওয়া, জুতোয় কালি দেওয়া, বাগানে জল দেওয়া, মামার গড়গড়ায় তামাক সেজে দেওয়া, মামীর পান সেজে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ রাম করতে লাগল।

ও নিজে কিন্তু বাড়ির পান খেতো না। ওর জীবনে ঐ একটি মাত্র বিলাসিতা ছিল। দোকানে গিয়ে এক খিলি অখয়েরী গুণ্ডী মোহিনী পান দুপুরে না খেলে ভাত হজম হতো না ওর।

আমার বিধবা সেজমাসীর স্বামী খুব বড় লোকের বাড়ির ছেলে ছিলেন। ওঁদের অনেক বাড়িভাড়া, বস্তী, বাজার ইত্যাদি ছিল। স্বামীর অকাল-মৃত্যুতে সেজমাসী অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু উনি অবস্থার কারণে নয়, একা থাকতে চান না বলেই বড় মামার বাড়িতে থাকতেন।

সেজমাসী দেওরের ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন। সেই ছেলেটিও রামের প্রায় সমবয়সীই ছিল। সে লা-মার্টিনিয়ারে স্কুল-লিভিং সার্টিফিকেট নেওয়ার পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিল।

দীপ এমনিতে বুদ্ধিমান ছেলে ছিল, কিন্তু আর বেশি পড়াশুনা করলো না। বলত, ফালতু বেশি পড়াশুনা করে বাঙালী গ্লোরিফায়েড কেরানী তৈরী হয়।

ও সকাল ন'টায় ঘুম থেকে উঠত। দুপুরে তিনটেয় ভাত খেত, তারপর ছ'টা অবধি ঘুমোত। কোনো কোনোদিন বন্ধু-বান্ধব ডেকে তাস খেলতে বসত। অথবা সেজমাসীর কালো-রঙা ব্যুইক গাড়িটা বের করে বন্ধুদের নিয়ে, পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে কোথাও-না-কোথাও বেরিয়ে পড়ত। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিজের অবকাশ এবং ওর নিশ্চিন্ত আয়ু নিজের মনোমত স্টাইলে খরচ করতে জানত। এইরকম মন্থর পিতৃপুরুষনির্ভর দিনকাটানোর কারণে কোনরকম গ্লানি ও অপরাধবোধ ওকে পীড়িত করত না। ও নিজেকে বুর্জোয়া বলত, এবং তার জন্যে গর্ববোধ করত।

দীপ কখনও জোরে গাড়ি চালাত না। ধীরে-সুস্থে, রেখে-ঢেকে

চেখে-চেখে টেনশানহীন জীবন উপভোগ করার এক আশ্চর্য পরিশীলিত আর্ট ও ছোটবয়সেই রপ্ত করেছিল।

বছর পাঁচেক মালীর কাজ করার পরই আবিষ্কৃত হল যে, রাম জাতে ধোপা। মামাবাড়িতে জাতের বিচার কখনও ছিল না। জমাদার যে ছিল বাড়ির, বুধিয়া ; তার ছেলে গিদাই-এর সঙ্গে ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলে আমি বড় হয়েছি। গিদাই আমার অনুচর ছিল। এক থালাতে মিষ্টি খেয়েছি বরাবর। গিদাই চিরদিন আমাকে জল গড়িয়ে খাইয়েছে।

রাম জাতে ধোপা জানতে পেরে মামীমা একদিন বললেন, তুই কাপড় কাচতে পারিস ?

রাম বলল, হ্যাঁ।

সেদিন থেকে বাড়িতে ধোপা আসা বন্ধ হল। বাড়ির সকলের জামা-কাপড় কেচে শুকিয়ে ইস্ত্রী করে রাম যার যার ঘরে গুছিয়ে রাখত। তার ফলে ধোপার খরচ বেঁচে গেল।

বাড়িতে অন্য অনেক কাজের লোক ছিল, সেজমাসীমার দেখাশোনার জন্যে আয়া। অল্পবয়সী একটি মেয়ে, নাম লক্ষ্মী। মালী, ড্রাইভার, জমাদার সকলেই ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যদের অনেকানেক কাজ রামের ঘাড়েই চাপতে লাগল। আমরা বাড়িসুদ্ধ সকলেই রাম-ভক্ত হয়ে উঠলাম ধীরে ধীরে।

সংসারে সব জায়গাতেই এই নিয়ম। যে-বোকারা কাজ করে তাদের ঘাড়ে ফাঁকিবাজেরা কাজের বোঝা চাপিয়ে গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়ায়। রামকে পেয়ে অন্যরা তাই করতে লাগল।

চাহিদাহীন রাম সবসময়ই হাসিখুশী থাকত। কাজ বাড়লে যে মাইনে বাড়া উচিত এমন কোনো লজিক ওর জানা ছিল না।

জাতে ধোপা বলে কাপড় যদি কম কাচত তবে ওর মেজাজ গরম হয়ে যেত। ও বলত, ধ্যুৎ! ক্ষিদে হয় না। জোর করে কাপড়-জামা ছিনিয়ে নিয়ে যেত ও সকলের ঘর থেকে। মামীমা মাঝে মাঝে রাগ করতেন, বলতেন, মিছিমিছি এত সাবান খরচ করিস কেন? বিনা দরকারে?

কিন্তু অল্প কদিনেই রামের অপচেষ্টায় এ-বাড়ির প্রত্যেকের অভ্যেস খারাপ হয়ে গেল। সর্বনাশটা সে কারণেই। বাড়িতেও কেউ ইস্ত্রীবিহীন জামা-কাপড় পরতেন না। এমনকি রোজকার গেঞ্জী-আণ্ডারওয়ার-রুমাল সবকিছু পাট পাট করে কেচে ইস্ত্রী করে ও আমাকে পর্যন্ত বাবু করে একেবারে নষ্ট করে দিল। আমা-হেন লোকেরও মনে হতে লাগল যে, সবকিছু এমন কেতাদুরস্ত না-হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

কোনো জামা-কাপড় দু ঘণ্টার জন্যে পরলেও রামের দৌরাত্ম্যে তা আবার যে পরব তার জো'টি ছিল না।

ও বলত, এ কি পরা যায়? জামাটা যে একেবারে গেছে।

গরমের দিনেও পায়জামা, পাঞ্জাবীতে মাড় দিয়ে ইস্ত্রী করত ও। শোবার সময় গায়ে কাঁটার মত বিঁধত তা। ওকে বললেও শুনত না। ওর গ্রামের চারপাশের গভীর জঙ্গলের শুয়োরের মতই জেদী ছিল রাম। কোন্ কথাটা কেন বলা হয় তার কারণ বোঝার মত মাথা ও জ্ঞান ওর ছিল না।

রাম ওর সরল বুদ্ধিতে মনে করতে লাগল যে, ওর এ বাড়িতে যতটুকু অধিকার আমার ও দীপেরও তাই—কারণ ও মামা, মামীকে এবং সেজমাসীকে নিজের মা, বাবা, পিসীর মতই ভালোবাসে; মান্যি গণ্যি করে। আমাদের জন্যে ও জীবন পর্যন্ত দিতে পারে।

ওর পরম মূর্খামিতে ও মানতে রাজী ছিল না যে, সংসারে ভালোবাসা দিলেই যে ভালোবাসা ফিরে পাবে এমন নিয়ম নেই কোনো।

দীপ মাঝে মাঝে তার প্রাণপ্রাচুর্যের আধিক্যে এবং করণীয় কিছু না-থাকাতে ওর পিছনে লাগত। ওকে পিছন থেকে চাঁটি মারত, জল খেতে খেতে ওর গায়ে কুলকুচি করে ফেলত। আসলে চিড়িয়াখানার গরাদবন্দী বাঘকে যেমন সাহসী জামাইবাবুরা সুন্দরী শালীদের সামনে ছাতা বা লাঠি দিয়ে খোঁচান, তেমন করে দীপ দেখত এই নিরুপায়, পরনির্ভর, দুটো ভাতের প্রত্যাশী ওর সমবয়সী মানুষটা কতখানি সইতে পারে।

খুব রেগে গেলে, একেবারে অসহ্য হলে রাম ফোঁস ফোঁস করত। দীপের নিরন্তর আদেশ এবং অবুঝ ফরমাস কখনও কখনও অমান্যও করত। তখন দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে ওকে বলত, গ্যাখ রাম, তুই চাকর, সবসময় চাকরের মত থাকবি।

এই কথায় রাম ক্রুদ্ধ হত না; বড় ব্যথিত, আহত হত। ও আমাদের সকলকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে যা দিত তা চাকর হিসেবে নয়। ও যা পেত তার চেয়ে অনেক বেশি দিত। কারণ ওর হৃদয় বড় ছিল। সংসারে নিতে, এবং নিক্তির মাপে মেপে নিতে পারে সকলেই; কিন্তু বেহিসাবীর মত দিতে বেশি লোকে পারে না। ওর মা বাবা ভাই বোন সকলকে ছেড়ে-আসা সদ্যযুবক মানুষটা, ওর গ্রামের ঘুঘুর ডাক, ওর নদীর নীলাভাষ, পড়ন্ত বেলায় চুলে বুনো ফুল গুঁজে কলসী-কাঁখে নদীতে জল আনতে-যাওয়া ওর কোনো মনোমত কিশোরীর স্বপ্ন, ওর গ্রামের পথের মিষ্টি ধুলোর গন্ধ, ওর জঙ্গলের রাতের নিশাচর জানোয়ারের ডাক-ভরা নির্মল নিষ্কলুষ পৃথিবী এবং দিগন্তবিস্তৃত তারা-ভরা আকাশ থেকে বঞ্চিত হয়ে ও আমাদের

মেকী ভালোবাসা নিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ও নিজেকে মিথ্যামিথ্যি ভাগ্যবান বলে মনে করত। ও মনে করে আনন্দ পেত যে, আমরাই ওর সব। তাই মিথ্যা হলেও ওর সেই পরম গর্বের জায়গায় যখন দীপ তার নোংরা অশিক্ষিত বুর্জোয়া আত্মাভিমান নিয়ে ঘা দিত তখন ওর বড় লাগত।

স্কুল থেকে ফিরে আমি টেনিস খেলতে যেতাম। খেলে এসে যখন আমার ঘরে পড়তে বসতাম, তখন আমার ঘরের পাশের বারান্দায় বসে ও সুর করে ওড়িয়া রামায়ণ পড়ত।

এই ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের কাছে রামায়ণ মহাভারতের ভূমিকা যে কত বড়, কত পরিব্যাপ্ত তা রামের রামায়ণ পাঠের তন্ময়তা লক্ষ্য করে আমি বুঝতে পারতাম। রামায়ণ পড়তে পড়তে ওর চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ওর ফেলে-আসা শৈশব, কৈশোর, ছিন্নমূল অস্তিত্বের সঙ্গে রামায়ণের চরিত্রগুলিই যেন এই পরদেশী ইট-কাঠ-পাথরের শহরের একমাত্র যোগসূত্র ছিল। ঐ ঘুমপাড়ানী গানের মত রামায়ণ পাঠের মধ্যে দিয়ে রাম ওর শহরের ইট-চাপা-ঘাসের মুমূর্ষু সত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করত।

অজানা ভাষায় গুণগুণ করে পড়া রামায়ণের সুরে আমার মনের দিগন্ত খুলে যেত। ঐ শব্দমঞ্জরীর মধ্য দিয়ে গ্রামগঞ্জের, বন-পাহাড়ের কোটি কোটি মানুষে-ভরা এই আসমুদ্র হিমাচলের ভারতবর্ষের গভীর মর্মবাণী আমার অল্পবয়সী হৃদয়ে অনুভব করতাম।

২

আমার যে মামাতো বোন, রুমি দিল্লীতে থাকত, সে কোলকাতায় এল কলেজের ছুটিতে। রুমি অতি রূপসী মেয়ে, বিদূষী তো বটেই। মামা মামীমা উঠে পড়ে লাগলেন রুমির বিয়ের জন্যে। কিন্তু ও বিয়ে করতে চায় না। তাছাড়া রুমি সম্বন্ধ করে বিয়ে করার কথা ভাবতেও পারে না। রূপে গুণে রুমির যোগ্য ছেলে হঠাৎ পাওয়াও মুশকিল। ও যখন এল, আমারও তখন ছুটি। রুমি আমার সঙ্গে রোজ টেনিস খেলতে যেত বিকেলে। দীপ রক্তসূত্রে আমাদের আত্মীয় নয়। কারণ সেজমাসীর দেওরের ছেলে সে। কিন্তু সমবয়সী হলেও এবং একবাড়িতে থাকলেও তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক কোনো যোগাযোগও ছিলো না আমার। রুমির দিকেও সে গড়িয়ে গিয়ে মেশার মত কোনো সমতলই পেলো না। দীপ নিজের জগৎ নিয়ে থাকত। সেই জগৎ সম্বন্ধে আমি ও রুমি নিরুৎসাহ ছিলাম।

রুমি ছুটিতে এসে যে-ঘরে থাকত দোতলায়, তার পাশের ঘরেই থাকত দীপ। দুটি ঘরের মধ্যে একটি বাথরুম ছিল। বাথরুমের দুটি দরজা। দুই ঘরেই খুলত। যে যখন বাথরুমে যেত, তখন ভিতর থেকে অন্য ঘরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিত। চান সেরে জামা-কাপড় পরে তারপর খুলে দিত সে দরজা।

একদিন, সেদিনটা রবিবার কি কোনো ছুটির দিন, আজ আর মনে নেই ; হঠাৎ রুমির প্রচণ্ড চিৎকারে চমকে গিয়ে দোতলার সিঁড়ি

বেয়ে আমি উপরে উঠলাম। রুমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেয়ে। কথা বললেও ফিসফিস করে বলে।

কী হল, তা জানতে মামা, মামীমা, সেজমাসী প্রত্যেকেই যে যার ঘর থেকে দৌড়ে এলেন।

একদৌড়ে দোতলার সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ যখন আমি পৌছেছি তখন হঠাৎ দেখলাম দীপ রামকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে হুড়কো টেনে দিল বাইরে থেকে।

ততক্ষণে সকলে রুমির ঘরের বন্ধ দরজার সামনে জড়ো হয়েছেন।

মামীমা, সেজমাসী সকলেই বলছেন, রুমি কি হয়েছে? দরজা খোল।

রুমি ওর ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দরজা খুলল। জল-ভেজা একটি অনাবৃত হাঁস-ফর্সা বাহু দরজার পাল্লা ঠেলে দিলো। মামীমা ও সেজমাসী ঘরে ঢুকে গেলেন।

বুঝলাম, রুমি চান করছিল। তখনও জামাকাপড় পুরো পরেনি।

আমি ও বড় মামা বোকার মত ওর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দীপ আস্ফালন করে বলল, ব্যাপারটা কি আগে জানি তারপর মজা দেখাচ্ছি।

আমি ও মামাবাবু কিছুই না বুঝে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মামীমা একটু পরে রুমির ঘর থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত ও বিরক্ত গলায় বললেন, এ কি? বাড়ির মধ্যে এসব কি?

রাশভারী মামা বললেন, কি হয়েছে?

ততক্ষণে রুমি সেজমাসীর সঙ্গে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে বলল, বাবা এ-বাড়িতে একজন ভয়্যার আছে। আ পারভার্ট।

উ্য মাস্ট ফাইণ্ড আউট হু হি ইজ।

দীপ অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, আমার ঘরে তাকে বন্দী করে রেখেছি। দরজার হুড়কো খোলো, দেখতে পাবে।

বড়মামা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে দরজার হুড়কো খুললেন, তারপরেই রামকে হাত ধরে টেনে বাইরে এনে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় লাগালেন।

তিনি আর কিছু করবার আগেই দীপ গিয়ে রামের ঘাড়ে পড়ে তাকে সমানে কিল চড় লাথি বৃষ্টি করে যেতে লাগল।

ব্যাপারটা কি যে ঘটেছে তখনও আমি পুরো বুঝিনি। সত্যি কথা বলতে কি, 'ভয়্যার' কথাটার মানেও জানতাম না তখন আমি। অথচ এমন কিছু ঘটেছে যা লজ্জাকর ও অত্যন্ত বিরক্তিকর। রুমির মুখ চোখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারছিলাম। সেই অবস্থায় দীপকে বাধা দিতে গেলে, আমি হয়ত অপরাধীকে প্রশ্রয় দিচ্ছি এমন কথা রুমির ও মামা-মামীমার মনে হতে পারত। তাছাড়া অপরাধটাও যে ঠিক কি তাও তখনও জানতে পারিনি।

রাম বারবার কি যেন বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু দীপ তাকে কিছুমাত্র বলতে না দিয়ে মারের চোটে মুখ বন্ধ করে তাকে ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামিয়ে আনার ফন্দী করছিল। এবং মার খেতে খেতে রাম হটে যাচ্ছিল।

রামকে মারতে মারতে ও ঠেলতে ঠেলতে দীপ রামের সঙ্গে-সঙ্গে নিজেও নীচে নেমে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে রুমি দীপের ঘরে ঢুকল। ঢুকেই, দীপের ঘর থেকে যে বাথরুমে যাওয়ার দরজা আছে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজতে লাগল।

আমরা সকলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ রুমি চেঁচিয়ে বলল, পেয়েছি।

মামাবাবু রুমিকে সরিয়ে দিয়ে নীচু হয়ে বসলেন, তারপর বললেন, রাসক্যাল।

ওঁরা সকলে দীপের ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমিও হাঁটু গেড়ে বসে রহস্যটা আবিষ্কার করলাম। সুন্দর বার্মা-টিকের পালিশ-করা দরজার মাঝামাঝি কেউ কোনো যন্ত্র দিয়ে একটা ফুটো করেছে। সেই ফুটোতে চোখ লাগালেই বাথরুমের পুরোটা দেখা যায়। বাথটাবটাও পুরো। রুমির ছাড়া জামা-কাপড় সব পড়ে আছে ডার্টি-লিনেন বক্সের উপর। বাথটাবে তখনও বাথসল্ট মেশানো ফেনাময় জল ভরা। রুমি তাড়াতাড়িতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসায় টাবের জল ছাড়েনি তখনও।

রুমি রাগে লাল হয়ে তুতলে বলল, বাবা ঐ লোকটাকে, রামকে ঘাড় ধরে এক্ষুনি বার করে দাও।

মামীমা ওকে শান্ত করবার জন্যে বলছিলেন, তোর কোনো ক্ষতি ত করেনি, গরীব মানুষ, গ্রামের মানুষ; তোর মত সুন্দরী মেয়ে দেখেনি, তাই না-হয় একটু দেখেছে!

রুমি বলল, মা, ইউ হ্যাভ গান আউট অফ ইওর মাইণ্ড! দেখবে মানে? আমি যখন ন্যুড হয়ে বাথটাবে শুয়ে রয়েছি তখন দরজা ফুটো করে দেখবে? বাথরুমে আমি কি করি না করি একজন লোক তার ডার্টি প্রাইং চোখ দিয়ে তা দেখবে? এর চেয়ে জঘন্য অপরাধ কি হতে পারে? হরিবল্! ভাবা যায় না। তোমরা···

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে শুনলাম রুমি স্বগতোক্তি করছে, সব পুরুষ মানুষ সমান। এরা কি সুস্থতা জানে না?

আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। ও যেন পরোক্ষে আমাকে এবং দীপকেও অপমান করল।

আমি একতলায় গিয়ে আমার ঘরে ঢুকলাম। দেখি, সেখানে রাম পা-ছড়িয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। এবং দীপ, যে কোনো-দিনও আমার ঘরে ঢোকে না, সে সমানে আমারই চেয়ারে বসে রামকে শাসাচ্ছে।

আমি ঢুকতেই রামের কান্না উথলে উঠল। ও ভাবত, আমি ওকে ভালবাসি। ও বলল, দাদাবাবু, আমার মায়ের দিব্যি, ভগবানের দিব্যি করে বলছি, আমি কিছুই জানি না। আমি উপরের বারান্দায় ঝাড়-পোঁছ করছিলাম, হঠাৎ দিদিমণির চিৎকার শুনলাম ঘরের ভেতর থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে দীপবাবু আস্তে করে দরজাটা খুলে আমাকে ধরে ঢুকিয়েই দরজা বন্ধ করে দিয়ে হুড়কো আটকে দিলো। তারপর ত দেখেছোই তোমরা।

রামের কথা শুনে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেলো। ঘাম হতে লাগল অস্বস্তিতে। কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে আমি দীপকে বললাম, দীপ, তুমি যে ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়েছো সেটা আমিও দেখেছি। কি ব্যাপার? কি হয়েছিলো আসলে?

দীপ নার্ভাস হাতে একটা সিগারেট ধরালো। বলল, ঋদ্ধি, যতটুকু তুমি দেখেছো ততটুকু *ঠিকই* দেখেছো; কিন্তু তার আগের ব্যাপারটা দেখোনি। এই বাস্টার্ড এখন যা ইনভেন্ট করে বলছে···

একটু থেমে দীপ বলল, যা বলছি কেয়ারফুলি শোনো। আমি বারান্দাতেই ছিলাম, রাম ঘরের ভিতরে কাজ করছিল, হঠাৎ রুমির চিৎকার শুনে দেখি রাম ঘর থেকে দৌড়ে বেরুল। কিছু একটা অপকর্ম করেছে বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে

ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপরের ব্যাপার ত তুমি জানোই। ইউ ওয়্যার ভেরী মাচ দেয়ার।

রাম সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, বলল, ঈসস, দীপবাবু!···যদি রাম সত্যি হয়, যদি সীতা সত্যি হয়, তবে তোমার বড় পাপ হবে। বড়ই···

আমি রামকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, দীপ, রাম কি বলছে? রামকে আমি প্রথম দিন থেকে জানি। তুমি ওকে জানো মাত্র দু বছর। রামের কথা একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না।

আমার কথা শেষ হবামাত্র দীপ এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে একটা মিলিয়ন-ডলার প্রশ্ন করল।

খুব আস্তে আস্তে, কেটে কেটে বলল, ঋদ্ধি, আর উ্য টকিং সেন্স? কি বলতে চাইছ তুমি? তুমি কার কথা বিশ্বাস করবে? কাকে বিশ্বাস করবে? তোমার ক্লাসের, তোমার স্ট্যাটাসের একজন মানুষ যা বলছে সেই কথাটাকে ফেলে দিয়ে তুমি একজন চাকরের কথা বিশ্বাস করবে? তুমি কি এই-ই বলতে চাও যে, তোমার কাছে রামই বেশি, আর আমি কেউই না?

আমি চুপ কবে রইলাম।

দীপ আবারও বলল, তোমার মনে আমি যা বলছি সে সম্বন্ধে যদি কোনো সন্দেহ থাকেও, তাহলেও বেনিফিট অব ডাউটটা তোমার আমাকেই দেওয়া উচিত নয় কি? কারণ···

দীপ একটু থেমে ভেবে বলল, কারণ আমার স্টেকটা খুব বড়। তুমি যদি ভুল করো? তুমি খুব ভালো করেই জানো যে, আমি কেমন এবং কতখানি ফেস-লুজ করবো সকলের কাছে—হোয়ার‍্যাজ রাম হ্যাজ নাথিং টু লুজ। ওর এখান থেকে চাকরি গেলে হি উইল ফাইণ্ড

অ্যানাদার ইন নো টাইম। ইট ডাজন্ট মেক এনী ডিফারেন্স ফর হিম : কারণ শালার ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

আমি তখনও চুপ করে রইলাম।

দীপ খুব ঘামছিল। একটু চুপ করে থেকে ও আবার আমাকে বলল, ভুলে যেও না, ঋদ্ধি; আমরা এক ক্লাসের, একই সমাজের লোক। তুমি রামকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে মারতে পারো না। উ্য জাস্ট কাণ্ট এ্যাফোর্ড টু ডু ইট। আমার সঙ্গে রামকে ইকুয়েট কোরো না। প্লিজ ডোণ্ট।

সেই মুহূর্তে, আমার উনিশ বছরের জীবনে প্রাপ্তবয়স্কতায় এবং প্রাপ্তমনস্কতায় আমি প্রথম তীব্রভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমি কত অসহায় অথবা আমি নিজে কতবড় ভণ্ড। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা গ্লানি শিরশির করে ঠাণ্ডা সাপের মত উঠানামা করতে লাগল। সেই অবসন্ন মুহূর্তে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, রাম আমার বা আমাদের কেউই নয়। কারণ রাম আমার শ্রেণীর নয়। জানোয়ারের মত, কীটপতঙ্গের মত, মিথ্যে-শিক্ষায় শিক্ষিত, মিথ্যা অহমিকায় ন্যুব্জ কতগুলো ফালতু মানুষ আমরা, নিজের নিজের শ্রেণী-ভুক্ত হয়ে, শ্রেণী-নির্ভর হয়ে, স্বশ্রেণীকে শক্তি যুগিয়ে, ভালো থাকা, ভালো-খাওয়ার মূলে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে অন্য শ্রেণীভুক্তদের কিভাবে ঝুলিয়ে দিই, কিভাবে পদদলিত করি। দীপের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নেই, আত্মিক যোগ নেই কোনো, কিন্তু তবুও বুঝতে পারলাম।

দীপ কোনো কুটিল, ফৌজদারী আদালতের উকিলের মত বলল, দ্য চয়েস ইজ ইয়োর্স ঋদ্ধি। তুমি যদি সকলের কাছে বলতে চাও যে, রাম সত্যবাদী এবং আমি মিথ্যেবাদী তবে তাই-ই বলো। ও কে। ফাইন। উ্য লেট মী ডাউন!

আমি কিছু ভাবা বা বলার আগে রাম বলল, দাদাবাবু! বলেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। মারের চোটে ওর নাক মুখ ফুলে উঠেছিল, ঠোঁটের কোণা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।

ঠিক সেই সময় আমার ঘরের দরজা সশব্দে ধাক্কা দিয়ে খুলে সেজ-মাসীর আয়া লক্ষ্মী এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে।

সুশ্রী, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ওর বয়স হবে উনিশ-কুড়ি। শুনেছি, জয়নগর-মজিলপুরে বাড়ি। সেজমাসী এখানে আসার পর থেকেই আছে ও। চিরদিনই ঠাণ্ডা ; মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। কখনও এর আগে চোখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত আমার দিকে। কোনো কাবণে একদিনও আমার ঘরে ঢোকেনি। এই প্রথম এবং এমন স্পর্ধার সঙ্গে সশব্দে ও আমার ঘরে ঢোকাতে আমি চমকে উঠলাম।

লক্ষ্মী আমার দিকে চেয়ে বলল, দোষ নিওনি দাদাবাবু! আমরা হলুম গিয়ে ছোটনোক।

তারপর দীপকে দেখিয়ে বলল, আর এনারা হলেন ভদ্দরনোক। আমি তোমাকে মা কালীর দিব্যি করে বইলতিচি, রামের কিন্তুক কোনোই দোষ লাই।

তারপরই দীপের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, কি গো ভদ্দরনোক, বলব তোমার গুণের কথা! বলি? আমরা ছোটনোক বলি কি মানসম্ভ্রম লাই গো? তুমি ভেইবেছটা কি? চাকরি লা-হয় ছেইড়েই দেব, আধপেইটা খেইয়ে বেঁইচে আছে ভাই-বোন, লা-হয় না-খেইয়েই তারা মরুক। তাই বলে এত বড় অল্যায়! তোমার অল্যায়টা অল্যায় লয়? রাম বিচারা সাতে লাই; পাঁচে লাই।

লক্ষ্মী উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল। দম নিয়ে বলল, দরজা ফুটো কইর‍্যে মেইয়েছেলির ন্যাংটো দেখার দরকার কিসের? বাপ-ঠাকুর্দারা

ত ঘরে বইসে খাওয়ার তরে অনেকই রেইখ্যে গেছেন—তা বাবু সোনাগাছি গেইলেই ত পার। সিখানি অনেক ন্যাংটো মেইয়েছেলি নাচ দেখাবিখন। মরতে, নিজের বোনের পৌদি কেন?

লজ্জায় আমার কান মাথা ঝা ঝাঁ করে উঠল।

আমি রামকে ডাকলাম, রাম, আয়।

কিন্তু আমি বেরুবার আগেই রুমি এবং তার পিছনে অন্য সকলে আমার ঘরে প্রশেসান করে ঢুকলেন।

রুমি দীপের দিকে আগুনের চোখে তাকিয়ে থাকল এক পলক, তারপর বড়মামাকে বলল, বাবা! লুক এট দিস পার্ভার্ট।

সেজমাসী কেঁদে উঠলেন, দাদা, আমার ছেলেকে মিথ্যে অপবাদ দিও না।

লক্ষ্মী সকলকে অবাক করে সেজমাসীর মুখের উপর বলে উঠল, মিথ্যেটা কিসের মাসীমণি? তোমার ছেইলের গুণপনা শুনবে? আমাদের হাইরাবার ভয়টা কি? মান সম্মানও ত হাইরে বইসেই আছি। বইলেই ফেলি সব তালে, শুইনবে? সাহস আছে সব শুইনবার?

বড় মামা লক্ষ্মীকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, লক্ষ্মী, তুমি চুপ করো।

সেজমাসী বললেন, তুমি একটা চাকর আর ঝি-এর কথায় এমন নোংরা অপবাদ দেবে দাদা দীপের নামে?

বড়মামা স্তব্ধ গম্ভীর গলায় বললেন, অপবাদের কাজ করলে অপবাদ না দিয়ে কি করি?

সেজমাসী কেঁদে ফেললেন, বললেন, ভদ্রলোকের ছেলেকে এত বড় অপমান!

লক্ষ্মী ফুট কাটল, ভদ্দরনোক আর ছোটনোক কি গায়ে নেকা থাকে মাসীমা ? তা হয় ব্যাভারে।

বড় মামা ধমক দিলেন, লক্ষ্মী !

রুমি রামকে নিয়ে গেল হাত ধরে উপরে। নিজে শুশ্রূষা করল ওর সামনে মেঝেতে বসে। নিজে হাতে ওকে গরম চা করে খাওয়াল।

রাম কথা বলছিল না কোনো। ঝর ঝর করে কাঁদছিল শুধু।

সেজমাসীমা তখনকার মত একটি ট্রাঙ্ক নিয়ে দীপের সঙ্গে চলে গেলেন ওঁর এক দেওরের বাড়ি। যাবার আগে মামীমাকে বলে গেলেন, আমি কদিন ঘুরে আসব পুরী থেকে। কিন্তু এই মিথ্যা অপবাদ যেন এ বাড়িতেই চাপা থাকে। এই কথা দাও বৌদি !

বড়মামা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, এ-কথাটা বড় মুখ করে সকলকে বলার নয় রানু। তুই আমার বোন, ভুলে যাস না। দীপ তোর ছেলে। নিজের না-হলেও, তোর দেওরের ছেলে। তোর পোষ্যপুত্র ! লজ্জাটা আমারও কম নয়। ছিঃ ছিঃ। রাম সত্যি সত্যিই এ-কাজ করলে খুশী হতাম আমি।

ছোটলোকদের কাছেও মাথা উঁচু রইল না রে আর !

সেজমাসী বললেন, এই হতচ্ছাড়ি লক্ষ্মীকে এখুনি বিদেয় করব আমি।

বড়মামী বললেন, ও কি করল ?

লক্ষ্মীকে তখনকার মত রুমির দেখাশোনা করার জন্যে বড়মামীই রেখে দিলেন। চাকরীটা থাকল, মালকিন বদলালো।

সেজমাসী চলে গেলে দোতলার বারান্দায় বসে লক্ষ্মী বলল, ঐ ছেলের জন্যে আবার এত গুণকীর্তন, সব ত তাও ফাঁস করিনি।

রুমি রামের পরিচর্যা করতে করতে লক্ষ্মীকে বলল, তোমার কাছে কেউ শুনতেও চাচ্ছে না।

তারপর বলল, তুমি একটু রামের দেখাশোনা কর তো এবারে বক বক না করে।

লক্ষ্মী ফিক করে হাসল। বলল, হায়রে আমার রামরে। রাবণ তোমার কী দশাটাই না কইর্‌য়ে গেল। এমনিই হয় গো; এমনিই হয়। ঘোর কলি। এখন রাবণদেরই জয় জয়কার।

তারপরই বলল, এইসো দিকি রামবাবু, কুথায় কুথায় বাণ লাগল তোমার দিকি ?

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলাম একতলায়; রুমি আমায় ডাকল। বলল, এই ঋদ্ধি শোন।

আমি ল্যাণ্ডিং-এর সামনে দাঁড়ালাম।

রুমি এগিয়ে এল। লাল সাদা একটা তাঁতের ডুরে শাড়ি পরেছিল ও। একটা লাল ব্লাউজ। সিঁড়ির পাশের কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলো এসে পড়েছিল ওর মুখে। আগুনের মত ওর গায়ের রঙে, ওর উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত কালো চোখে ওকে অষ্টমীর দুর্গা প্রতিমার মত দেখাচ্ছিল।

আমার ভয় করছিল, কেন জানি না।

রুমি এসে ওর সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, গরীবদের উপর তোরা বড় অত্যাচার করিস। মানুষ বলে মনে করিস না ওদের।

তারপরই হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, ভাবছি, আমি এদেশে থাকবো না। চলে যাবো। দেখিস, স্কলারশিপ না পেলেও যেমন করে হোক চলে যাবো। দাদাকে লিখব, দেখিস।

আমি বললাম, দেশটা ত আমাদের। আমার, তোর, রামের সকলের। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবি কেন?

তারপর বললাম, পরে তোর সঙ্গে কথা বলব রুমি। তুই আজ বড় আপসেট হয়ে আছিস।

আমি আমার ঘরে এসে পুরো ব্যাপারটার আকস্মিকতা এবং আমার রিঅ্যাকশানটা খতিয়ে দেখছিলাম।

দীপের কাছে কেন আমি বলতে পারলাম না, যা আমার মন বলছিল? দীপ আমার নিজের শ্রেণীর বলেই কি দীপকে লেট-ডাউন করতে আমার ভয় করছিল? দ্বিধা হচ্ছিল? না কি এ সংস্কার? না অন্য কিছু? আমি কি রিঅ্যাকশনারী? রিঅ্যাকশনারী কাদের বলে?

অথচ লক্ষ্মী! পরের বাড়ি সামান্য টাকার বিনিময়ে আয়ার চাকরি করা একটি অল্পবয়সী মেয়ে। ও কেমন মাথা উঁচু করে যা বলার বলল। দীপের মুখোশ খুলে দিল।

লক্ষ্মীও কি রামের শ্রেণীর মানুষ বলেই রামের পাশে এসে দাঁড়াল?

৩

আমাদের রামের জামাকাপড়ের বিশেষত্ব ছিল। ও কখনও কেনা শার্ট বা অন্য কারো পুরোনো শার্ট পরতো না। ধুতিও কখনও পুরোনো বা অন্য লোকের দেওয়া পরতো না। শার্টের কাপড়টা লম্বা স্ট্রাইপের ছিট হওয়া চাই। ও গলির মোড়ের হানিফ দর্জিকে দিয়ে

হাফ-শার্ট বানাত এবং শার্টের হাতা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা অদ্ভুত কাজ করা থাকত ফিতের লেজের মত। ও ধুতি ও শার্ট ছাড়া কিছুই পরতো না। সবসময় জামা-কাপড় পরে থাকত। বাড়ির সব কাজ শেষ হলে দুপুরে ও রাতে জামাকাপড় ছেড়ে গামছা পরত। চান করে খেয়ে ঘুমোত তারপর। দুপুরে ওর কাজ সারতে সারতে প্রায়ই দুটো-আড়াইটে হত। কাজ না থাকলেও ও কাজ বানিয়ে নিত। তাবপর তাকে ছটার আগে আর কখনও দেখা যেত না। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও তখন রামকে কেউই পেত না। তখন রাম কুম্ভকর্ণ হয়ে যেত।

ঘুমুবার সময় ও হাতঘড়ি পরে ঘুমোত। বড়মামা ওকে একটা এইচ-এম-টি ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন। প্রথম এইচ-এম-টি ঘড়ি বেরুনোর পর। ভেবেছিলেন, ওর সময় জ্ঞান হবে। অথচ আমাদের কারো সামনেই ঘড়িটা পরতে ও লজ্জা পেত। কখনও দোকানে বাজারে গেলে তখন পরে যেত ঘড়িটা। পকেটে একটা আমার দেওয়া বল-পয়েণ্ট পেনও সবসময় গোঁজা থাকত। দোকান থেকে ফিরেই গেটের কাছে এসে ঘড়িটা খুলে পকেটে পুরে ফেলত। ওর চটিজোড়াও হাতে নিত।

অনেক পুরুষের শিক্ষা বা সংস্কারে ও জেনেছিল যে বাবুদের সামনে, ওর গাঁয়ের জোতদার বা রাজার সামনে জুতো পরা বা বাবুয়ানী দেখানো গর্হিত অপরাধ। আমাদের সামনে জুতো পরার মধ্যে দোষ নেই কোনো, একথা ওকে বোঝাতে পারিনি কখনও কারণ ও বুঝতে চাইত না।

ওকে বহুদিন বুঝিয়েছিলাম আমি যে, ঘড়িটা সময় দেখারই জন্যে। ওটা লুকিয়ে রেখে আর ঘুমুবার সময় পরে থেকে লাভ কি?

ও কখনও উত্তরে কথা বলতো না, লাজুক হাসি হাসত।

একদিন হঠাৎই আবিষ্কার করলাম যে, রাম ঘড়ি দেখতেই জানে না। ওর হাতঘড়ি ত নয়ই, টেবল ক্লক বা দেওয়ালের বড় গ্রাণ্ড-ফাদার ক্লক কোনোটারই কাঁটার কম্বিনেশান ওর মাথায় ঢুকতো না। হাত-ঘড়িটা ও একটা গয়না হিসেবেই ব্যবহার করত।

ও যখন সন্ধেবেলা ইস্ত্রী করত, আমার ঘরের পাশের ঘরে, যেখানে অনেক অপ্রয়োজনীয় পুরোনো জিনিস গুদোম-করা ছিল, ও একটা ট্রানজিস্টর বাজিয়ে কটক স্টেশান ধরে গান শুনত। ট্রানজিস্টরটা মাসীমা দিয়েছিলেন ওকে। হাতে বানানো। ওই পাশের বাড়ির চাকর বিশুর কাছ থেকে খবর নিয়ে এসে, মাসীমার কাছে বায়না ধরেছিল। বিশুই কিনে এনে দিয়েছিল, দীপের দেওয়া টাকাতে। একশ দশ টাকায় কিনেছিল ওটা।

সন্ধেবেলায় ইস্ত্রী করতে করতে একটু গান শোনাই ছিল ওর দৈনন্দিন জীবনের একমাত্র আনন্দ বা রিক্রিয়েশান। এ ছাড়াও প্রতি মাসে একবার করে ও কালিঘাটে যেত। খেয়ে-দেয়েই বেরিয়ে পড়ত। ফিরত সেই সন্ধ্যে করে। জিগ্যেস করলে বলত, এই এটা-সেটা কেনার ছিল তাই গেছিলাম।

রাম অবাধ্যতা করলে মাঝে মাঝে আমার কাছে চড়-চাপড় খেতো। আমিও হঠাৎ হঠাৎ রেগে যেতাম বলে নিজেকে সামলাতে পারতাম না। মা বলতেন, ছিঃ ছিঃ! লোকজনের গায়ে হাত তুলিস কেন? এ কি অভদ্রতা!

আমি বলতাম, তুমি জানো না, ওকে না মারলে ও ঠিক থাকে না।

কিন্তু মনে মনে জানতাম, ওটা আমার অন্যায়। কিন্তু রামের

সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়েছিল। যদি অন্য কারো সামনে ওকে গালাগালি করতাম তাহলে ও ভয়ানক অপমানিত বোধ করত। কিন্তু ঘরের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার যাই-ই হোক না কেন তাতে আমাদের দুজনেব কেউই কিছুই মনে করতাম না। রাম আমাকে কখনও মারেনি বটে, তবে ও গালাগালি করতে মোটেই ছাড়ত না। খুব রেগে গেলে তুই তুই করে বলত আমাকে। বলত, রইল তোর চাবি-তালা, রইল তোর ঘর দোর, দেখি কোন্ বউ এসে তোকে এমন করে দেখাশুনা করে!

আমার সঙ্গে ওর দাম্পত্য সম্পর্কের মত একটা অবর্ণনীয় মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কের গভীরতা বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। বিয়ে করলে আমার মা যেমন আমাকে হারানোর মত একটা বেদনাবোধ অনুভব করবেন বলে আমার ভয় ছিল, রামেরও একটা সেরকম অনুভূতি হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমার।

একটা সময় এসেছিল পরে, যখন মা যেখানেই কোনো অবিবাহিত মেয়ে দেখতেন, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বা পথে-ঘাটে তখনই তাকে তাঁর ছেলের বউ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগতেন। মা একবার কুণ্ডু স্পেশ্যালে কেদারবদ্রী বেড়াতে গিয়ে ফিরে আসার পর আমাদের বাড়িতে অনূঢ়া কন্যা এবং তাঁদের মায়েদের ভীড় লেগে গেল। সেই সময় প্রাণের দায়ে আমি কদিন কোলকাতার বাইরে কাটিয়ে এলাম। মা খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন।

ফিরে এসে রামের কাছে কোন্ মেয়ে কেমন, কে শঙ্খিনী, কে পদ্মিনী, কে হস্তিনী তার রিপোর্ট পেয়েছিলাম। একটি মেয়েকে রামের খুব পছন্দ হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তাকে আমি দেখিনি। রাম বলত,

ঐ দিদিমণিকে তোমার বউ হলে খুব মানাত। ভারী লক্ষ্মী, শান্ত চেহারা। তোমাকে ঠাণ্ডা করে রাখত। তুমি ত চণ্ডাল!

রাম আমার কাছে কখনও চড়-চাপড় খেলে পরদিন সকালেই দশটা বা কুড়িটা করে টাকা পেত। মা বলতেন, ওর টাকার দরকার হলেই ও ইচ্ছে করে এমন কিছু করে যাতে করে তোর সঙ্গে ওর লেগে যায়। একবার আমি টাকাটা দিতে ভুলে গেছিলাম। পরদিন যখন বাইরে যাচ্ছি রাম মুখ নীচু করে বলল, আমার টাকাটা দিলে ভাল হত।

আমি হেসে ফেলেছিলাম, বলেছিলাম—তোর লজ্জাও নেই, বাঁদর। তারপর টাকাটা দিয়েছিলাম। ও-ও হাসতে হাসতে টাকাটা নিয়েছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল, অনেক কষ্টের টাকা।

সেদিনই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে একজন মানুষের অভাব কতখানি হলে, তার টাকার প্রয়োজন কত তীব্র হলে সে গাল-বাড়িয়ে চড় খেতে চায় দশটা-বিশটা টাকার জন্যে। বুঝতে পারতাম যে, মানুষের সম্মানবোধটোধ সব ফালতু। টাকার মত বড় আর কিছুই নেই এ-সংসারে।

বাড়িতে রামের সঙ্গে এই সমঝোতা ব্যাপারটা কেবল আমার সঙ্গেই ছিল। অন্য কেউই, এমন কি বড়মামা, এবং মাও ওকে তেমন বুঝতেন না। বড়মামা এমনিতে খুবই উদার লোক। কিন্তু মাঝে মাঝে উনি রামের সঙ্গে বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন।

রামের অসুখ হলে রাম মুখে কিছু না-দিয়ে তিন-চারদিন ওর ঘরে পড়ে থাকত। একবার রামের জ্বর খুব, সঙ্গে বমিও। সেদিন বড়মামার আদরের গ্রেট ডেন কুকুর ভিকটরেরও শরীর খারাপ। বমি করছে, পাগল পাগল করছে।

আমি বাড়ি ফিরে দেখি তুলকালাম কাণ্ড! বড়মামা জেদ ধরেছেন যে, রামকেই এক্ষুনি ভিকটরকে নিয়ে ভেটএর কাছে যেতে হবে। ওর কিছুই হয়নি। সব পেজোমি। সকালে বড়মামা ওকে বলেছিলেন বলেই ইচ্ছে করে ও অসুখের ভান করে পড়ে আছে।

আমি রামের ঘরে গিয়ে দেখি ও প্রায় বেহুঁশ হয়ে রয়েছে। আমি নাম ধরে ডাকতে চোখ তুলে চাইল। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ভালো ঠেকল না। আমি বললাম, ওষুধ খেয়েছিস ?

ও বলল, না।

কিছু খেয়েছিস সকাল থেকে ?

ঠাকুর বলল, সকালে চা আর মুড়ি খেয়েছিল তারপর কিছু খায়নি।

তোমরা কিছু বানিয়ে দিলে না কেন, বার্লি-টার্লি ?

ঠাকুর বলল, মা পিসীমা যদি ভাঁড়ার থেকে বের না করে দেন জিনিসপত্র তাহলে আমরা কি করে দেবো ? সকালে ওঁরা তারকেশ্বরে গেছেন এই-ই ত এলেন।

আমার খুব রাগ হল। বড়মামা না-হয় পুরুষমানুষ। মা এবং বড়মামীরও কি উচিত ছিলো না বেহুঁশ ছেলেটা কি খেল না খেল তা দেখা ? বাড়িসুদ্ধু সকলে ভিকটরের শরীর খারাপ নিয়ে চিন্তিত এবং মনমরা হয়ে ছিলেন। যেন মানুষের চেয়ে কুকুর বড় !

বড়মামাকে গিয়ে বললাম, রামের খুব শরীর খারাপ। এখন ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার ভিকটরকে ভেট দেখানোর আগে। আমি রামকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

বড়মামা রেগে বললেন, ঋদ্ধি! ভিকটরের সঙ্গে রামের তুলনা করবি না। তুই আজকাল বড় বেশি বুঝছিস। তোর কথাবার্তা

হাবভাব আজকাল সব কম্যুনিস্টের মত হয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল্, আমিই নিয়ে যাব ভিকটরকে।

আমি বললাম, ড্রাইভার নাকি চলে গেছে।

কাকে বলে গেল? তোরাই কি এখন বাড়ির কর্তা হয়ে গেলি নাকি?

আমি চুপ করেই থাকলাম। বড়মামা রেগে গেলে অন্য কারো কথা না-বলাটাই নিয়ম। ছোটবেলা থেকেই এ নিয়ম মেনে চলে এ বাড়ির সকলে।

বড়মামা আবার বললেন, তোর বড বাড় বেড়েছে। বলেই, আমাকে গাড়ি বের করার সুযোগ না-দিয়েই নিজেই গাড়ি বের করে মালীকে নিয়ে ভিকটরকে সঙ্গে করে ভেটএর কাছে গেলেন, যদিও উনি গত দশ বছর স্টিয়ারিং-এ হাত দেননি।

আমি মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে ডাক্তারকে ডেকে এনে রামকে দেখিয়ে প্রেসক্রিপশান নিয়ে আবার ওঁর সঙ্গে গেলাম। তারপর ওষুধপথ্য করালাম ওকে।

কিছুক্ষণ পর বড়মামা ভিকটরকে ডাক্তার দেখিয়ে ফিরে এলেন।

ভ্যানকুইশড রামের খোঁজও নিলেন না।

৪

সরিৎ মেসো অনেকদিন পরে এলেন। ছিপছিপে, উপোসী ছারপোকার মত চেহারা। উনি আমার ছোটো মেসো। পার্লামেন্টের মেম্বার। এ রাজ্য কি অন্য রাজ্য থেকে দাঁড়ান আমার ঠিক জানা

নেই। কনষ্টিট্যুয়েন্সী বাঁধা আছে। দেশের অন্যতম অনগ্রসর এলাকাই হবে। কি করে প্রথম সেখানে শিকড় গাড়লেন তাও আমার জানা ছিলো না। মেসো প্রচুর সম্পত্তির মালিক। যদিও নিজের নামে কিছুই নেই। পার্লামেণ্টের সেশান চলাকালীন দিল্লীতেই থাকেন।

সরিৎ মেসোকে ভয় করে না এমন লোক নেই। উনি কলমের খোঁচায় লোকের চাকরি খান, টেলিফোন তুলে সরকারী কর্মচারীদের বদলী করে দেন; ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করলে যে-কোনো ব্যবসাদারের বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স কি কাস্টমস ডিপার্টমেণ্টকে দিয়ে রেইড করিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন।

মেসোমশায়ের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন মামাবাড়িতে ছোটো মাসীমার বিশেষ কদর ছিল না, কিন্তু এখন ছোটমাসীমা এই বাড়িতে ভি-আই-পি।

আজ সন্ধ্যে থেকে বাড়িতে হৈ হৈ। মেসো-মাসী খাবেন। পরদিন সকালেই মেসো দিল্লী যাবেন। এখানে কি সব মিটিং-টিটিং-এর জন্যে এসেছিলেন।

সকলে মিলে বসবার ঘরে বসে গল্প-গুজব হচ্ছে। বড়মামা বললেন, সরিৎ একটু হবে নাকি? ভালো স্কচ ছিল, অনেকদিন হল পড়েই আছে আলমারীতে। রিটায়ার করার পর আর এই সব বিলাসিতার সামর্থ্য আমার নেই।

সরিৎ মেসো বললেন, মালের উপর ট্যাক্স বেড়ে যা অবস্থা হয়েছে তাতে ত দোকান থেকে কিনে স্কচ খাওয়াই যায় না।

বড়মামা বললেন, দোকান ছাড়া আর কোথায় পাবো?

সরিৎ মেসো বললেন, সে লোক আছে, বলো ত তোমার কাছে

পাঠিয়ে দেবো। কোলকাতায় বাঘের দুধ পাওয়া যায় আর স্কচ! বাজারের ওয়ান-থার্ড দামে পাবে। এসব না খেলে ত আমাদের চলে না। এত স্ট্রেন। সারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা, জনগণের গুরুদায়িত্ব। মাথাটা শার্প থাকে এসব খেলে।

বড়মামা বললেন, বাইরে থেকে, মানে ত স্মাগলারদের কাছ থেকে। তা যে বড় রিস্কী শুনেছি। দাম কত পড়ে?

সরিৎ মেসো বললেন, রিস্ক্ কিসের? আমি থাকতে?

বড় মামা হাসলেন, তুমি তাহলে তোমার স্মাগলার বন্ধুকে বলে দিও। শীতকালে দু-একটা ব্রাণ্ডি-ট্র্যাণ্ডি আর বিশেষ অকেশানে দু-এক বোতল স্কচ।

সরিৎ মেসো বললেন, নো প্রবলেম।

তারপর বললেন, একটু খেলে আজ অবশ্য মন্দ হতো না, বড় ঝামেলা গেছে সারাদিন। তবে এই হাটের মধ্যে বসে নয়। তোমার বেডরুমে চল দাদা। আমাদের একটা ইমেজের ব্যাপার আছে ত! শালার দেশসেবা কী কম ঝকমারির কাজ।

এমন সময় রুমি দোতলা থেকে চটি ফটফটিয়ে দ্রুত নীচে নেমে এসে মামীমাকে চোখ বড় বড় করে বলল, মা জানো, আমার হীরের আংটিটা পাচ্ছি না! কি হবে?

কোন আংটিটা?

তুমি যেটা দিয়েছিলে।

বড়মামা তাড়াতাড়ি মামীমাকে শুধোলেন, কোন আংটিটা?

মামীমা বললেন, সেই একটা ছাড়া আবার কটা হীরের আংটি বানিয়ে দিয়েছিলে তুমি আমায়? সকলেই যেন সরিৎ-এর মত স্বামী।

তারপর মামীমা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, পাচ্ছিস না মানে? কোথায় রেখেছিলি?

রুমি বলল, মনে নেই। বোধহয় সাবান মাখার সময় বাথরুমেই খুলে রেখেছিলাম।

কখন বাথরুমে ঢুকেছিলি?

আধঘণ্টা আগে।

বেরিয়েছিলি কখন?

তা হবে, পনেরো মিনিট।

তোর চান করে বেরুবার পর আর কেউ ঢুকেছিল বাথরুমে?

লক্ষ্মী ঢুকেছিল বাথরুমে, পরিষ্কার করতে।

বড়মামা বললেন, রাম?

রামও গেছিল একবার উপরে।

বড়মামা বললেন, কোথায় যাবে তাহলে? ওদের জিজ্ঞেস করেছিস?

হ্যাঁ। ওরা বলল দেখেনি।

বড়মামা বললেন, দেখেনি মানে কি। আমরা ত কেউ নিইনি! সেজ আর দীপ ত কোলকাতাতেই নেই। আংটিটা ডানা গজিয়ে উড়ে গেল? রাম আর লক্ষ্মীর মধ্যেই কেউ নিয়েছে তাহলে।

মামীমা দুঃখিত ও বিরক্ত গলায় বললেন, কেন আগেই সন্দেহ করছো ওদের? ভালো করে খোঁজা যাক।

ছোটমাসী বললেন, তোমরা এই চাকরবাকরদের লাই দিয়ে দিয়েই মাথায় তুলেছো, ছোটলোকদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই।

সরিৎ মেসো বললেন, ছোটলোক বোলো না। ও কি?

ছোটমাসী বললেন, বলব না কেন? তোমার ওদের হাতে রাখা

দরকার ভোটের জন্যে। আমার কি? ছোটলোককে ছোটলোক বলব না?

মামীমা বললেন, দাঁড়া দাঁড়া, তোরা উত্তেজিত হচ্ছিস কেন এত? আমি গিয়ে দেখি। বলেই, মামীমা উপরে চলে গেলেন।

বড়মামা সরিৎ মেসোকে নিয়ে শোবার ঘরে গেলেন। ছোটমাসী আর আমি বসে থাকলাম বসবার ঘরে।

ছোটমাসী বললেন, খোকা, তোর পড়া-শুনা কেমন চলছে? মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করছিস ত? তোর হাবুদা ত স্কুল ফাইনালই পাস করতে পারলো না। এখন বাবার হয়ে দালালী করে খাচ্ছে। রোজগার অনেক। কিন্তু যেদিন বাবার সাঁটটি কোনো কারণে যাবে সেদিনই সব রোজগার বন্ধ। এসব ফেরেলবাজ লাইন আমার পছন্দ নয়।

তারপর বললেন, কি করবি ঠিক করেছিস? কোনোরকমে এম-এটা পাস কর তারপর তোর মেসো আছে। কোন্ কোম্পানীতে, কোন্ শহরে, কি চাকরি দরকার তা শুধু তোর ইচ্ছে। যা বলবি, তাই-ই হবে। আমি বললেই তোর মেসো করে দেবে।

আমি বললাম, দেখি···

ছোটমাসী বললেন, কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসছিস নাকি?

তারপর ঠোঁট উলটে বললেন, ও বাবাঃ। সে ত কঠিন পরীক্ষা। ভালো ছেলে হতে হয় তাতে। তা যদি পাসও করিস তাহলেও ত তোর ছোট মেসোর মত এম-পি এম-এল-এ-দের তাঁবেদারিই করতে হবে। আগেকার দিনের মত জাঁদরেল বাঘের বাচ্চা আই-সি-এসরা ত আর আজকাল নেই। জন্মায়ও না। দেখি ত তোর মেসোর কাছে কত কেষ্ট-বিষ্টু আসে রোজ তেল লাগাতে। বদলী, ভালো পোস্টিং,

সি-সি-রোল, উন্নতি, ডেপুটেশন এটা ওটা। তারা ত সারাদিন তেল মাখাচ্ছে ওদেরই।

আমার হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বললাম, দেশে বাঘ থাকলে ত বাঘের বাচ্চা পয়দা হবে ছোট মাসী? চারদিকে তাই এত কেঁউ কেঁউ মিউ মিউ। বাঘ কোথায় আর যে হালুম-হালুম শুনবে?

ছোটমাসী কিছুক্ষণ সোজা আমার চোখে তাকিয়ে থাকলেন। বললেন, তুই কি তলে তলে নকশাল হয়েছিস নাকি? তোর কথা-বার্তাও ভালো ঠেকছে না। মেলামেশা করিস নাকি ওদের সঙ্গে?

এমন সময় মা এলেন রান্নাঘরের সব তদারকী সেরে।

ছোটমাসী বললেন, দিদি, তোমার ছেলেটাকে একটু দেখো। ওর ভালোর জন্যে বলতে গেলাম যে, চাকরির দরকার হলে মেসোকে বলিস। তার উত্তরে যা বলছে তা শুনে আর তোমার কাজ নেই।

মা বললেন, খোকা! তুমি এত অসভ্য হয়েছো?

আমি হাসলাম, বললাম, বাঃ রে।

এমন সময় উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে বলতে মামীমা রুমিকে নিয়ে নীচে নেমে এলেন।

ছোটমাসী বলল, পেলে দিদি আংটিটা?

নাঃ। সব জায়গায় খুঁজলাম।

ছোটমাসী বলল, এখনও লোকগুলোকে ছেড়ে রেখেছো? পুলিশ ডাকো। হাতে তুলে দাও। মারের চোটে সব বেরোবে।

বড়মামী বলল, দাঁড়া দাঁড়া! অণু, তোর বড় মাথাগরম।

রুমি আমার ঘরে এল। বলল, এই দেশের লোকগুলো সব চোর।

আমি বললাম, ঠিক বলেছিস। তবে ছোট ছিঁচকে চোরগুলো কখনও কখনও ধরা পড়ে এবং শাস্তিও পায়। বড় বড় চোরগুলো জাঁক করে বেড়ায়।

রুমি বলল, তা আমি জানি না। বাট আই ডোন্নো হোয়াট টু ডু।

বড়মামার গলা শোনা গেল। ওঁরা এদিকে আসছেন।

ওঁদেব মুখ-চোখ দেখেই বুঝলাম, সরিৎ মেসো আর বড়মামা কয়েকটি কুইক-ওয়ানস্ মেরে এসেছেন।

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি করা উচিত খোকা?

উত্তেজিত না হলে বড়মামা আমাকে খোকা বলে ডাকেন। উত্তেজিত হলে বলেন, ঋদ্ধি।

আমি বললাম, কিসের কি?

বড়মামা বললেন, মানে লক্ষ্মী ও রামকে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করি?

আমি বললাম, আংটিটা যে ওরাই নিয়েছে শিওর না হয়েই?

সরিৎ মেসো বললেন, শিওর হবে কি করে? ওরা কি তোমাকে এসে বলবে আমি নিয়েছি!

ছোটমাসী বলল, দিদি, দুটোকেই চালপোড়া খাওয়াও।

বড়মামা বললেন, তুই এখনও বড় সেকেলে আছিস ছোট।

সরিৎ মেসো বললেন, ফোন করব পুলিশ কমিশনারকে?

ছোটমাসী বললেন, দাঁড়াও, খাওয়া-দাওয়াটা নির্বিঘ্নে চুকে যাক। তোমরা ডিনার কখন খাবে?

সরিৎ মেসো বললেন, দেশে এইরকম ক্রিমিনালদের ছাড়া রেখে কি স্বস্তিতে খাওয়া যায়?

বড়মামা বললেন, তবে কি করবে ?

সরিৎ মেসো বললেন, ডাকো ওদের।

রাম ও লক্ষ্মী দুজনেই এসে দাঁড়াল আলো ঝলমল বসার ঘরে।

সরিৎ মেসো বললেন, ভালো চাস ত এক্ষুনি আংটিটা বের করে দে। তোদের দুজনকেই বলছি।

রাম হাত জোড় করে বলল, আমি জানি না বাবু। আমি কি দিদির জিনিস নিতে পারি ? আমি নিইনি, দেখিনি আমি।

লক্ষ্মী ভুরু কুঁচকে সরিৎ মেসোকে দেখছিল। সেজমাসীর সঙ্গে লক্ষ্মী এ বাড়িতে এসেছে দু বছর আগে। বছরখানেকের মধ্যে ও এই লোকটিকে কখনও দেখেনি। তবে ছোটমাসীকে দেখেছে। বড় দেমাকী মেয়ে মানুষ। ভালো লাগেনি কখনও লক্ষ্মীর।

এবার সরিৎ মেসো লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বললেন, কি হে ভালো-মানুষের মেয়ে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জান না। বলো শীগগিরী আংটিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছো ?

লক্ষ্মী আরেকবার সরিৎ মেসোকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, মুখ সাইমলে কতা কও বইলতেচি। বাপ তুলবেনি।

লক্ষ্মীর কথা শুনে বড়মামা, মামীমা এমনকি মাও ঘাবড়ে গেলেন। ছোটমাসী ত রাগে অজ্ঞান হয়ে যাবার যোগাড়।

বড়মামা বললেন, লক্ষ্মী ! উনি কে তুই জানিস না। তোর ভীষণ বিপদ হবে। তুই ভদ্রভাবে কথা বল।

লক্ষ্মী বলল, ছোটনোকে আবার ভদ্দরভাবে কতা কইতে জাইনবে কি করে ? ভদ্দরনোক নই, ত আমি ভদ্দরনোক হই কি করে ?

সরিৎ মেসোর প্রেস্টিজ পাংচার করে দিলো লক্ষ্মী সকলের সামনে।

সরিৎ মেসো কি করবেন ভেবে না পেয়ে, মারমূর্তি হয়ে উঠে

গেলেন ওদের দিকে।

লক্ষ্মী বলল, সাবধান কইরতিছি বাবু। মেইয়েছেলের গায়ে যদি হাত তোল তোমার ও হাত আমি বঁটি দিয়ে দুই ফাঁক কইর্যো দেব।

সরিৎ মেসো মারমুখো হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, কি করে এখন নিজের সম্মান বাঁচাবেন বুঝে না-পেয়ে ঠাস করে রামের গালে এক থাপ্পড় কষালেন। গার্বেজ ডাম্প। বাবুরাম সাপুড়ের সাপ! ভয় কিসের তাকে?

রাম ঘুরে পড়ে গেল মেঝেতে।

তারপর স্তম্ভিত হয়ে, চার হাতে পায়ে উবু হয়ে বসে আমার, মায়ের, বড়মামা, মামীমা সকলের মুখের দিকে একবার নিজের মুখ তুলে তাকালো—। আমাদের সকলকেই ও বড় আপনার লোক বলে জানত। ওর দু'চোখে অবিশ্বাস এবং ওর প্রতি আমাদের সকলের এই বিশ্বাসঘাতকতায় ও বাকরুদ্ধ হয়ে রইল। তারপরই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

লক্ষ্মী ওকে ধমকে বলল, আরে মরণ! তুই দেখি আচ্ছা মরদ? তোকে মাইরল বিনা কারণে তুই ফিইরে দে না দু ঘা। ভদ্দরনোকের ভদ্দরনোকি কোতায় যায় দেখি। নাকি কাঁইদতে বইসলি। তুতু থুথু ফেইল্যা ডুইব্যে মইরগে যা। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

হঠাৎ গ্রেট সরিৎ মেসো বললেন, মুখ সামলে কথা বল্ মাগী।

আমরা সকলে এবং বড়মামাও চমকে উঠলেন ঐ অশ্লীল সম্ভাষণে।

লক্ষ্মী একটুক্ষণ চুপ করে রইল অবাক চোখে। তারপর বড়মামীর দিকে চেয়ে বলল, তোমার ছোট ননদটাকে এইকেবারে জইল্যে ফেইলেচো গো তোমরা। এ কোন্ রাবণ জুইটিয়েচো গো।

তারপরই সরিৎ মেসোর দিকে লাল চোখে চেয়ে বলল, মাগী ত দেকেচো ঢের! তবু আমাকে দেইখো ভুল কইরলে ?

সরিৎ মেসো লক্ষ্মীকে অগ্রাহ্য করে আমাকে বললেন, খোকা, এদের জামাকাপড় বিছানাপত্র কি আছে এখানে নিয়ে এসো। স্যুটকেস-ট্যাটকেসও।

আমি কিছু বলার আগেই ছোটমাসী এগিয়ে এলেন, বললেন, দাঁড়াও, আমি আনছি। বলেই, দুদ্দাড় করে বাগানে দৌড়ে গেলেন, গ্যারাজের পাশে ওদের ঘরের দিকে। তারপর বাইধর ও গিদাইয়াকে দিয়ে এবং নিজে হাতে করে ওদের সব সম্পত্তি নিয়ে এলেন।

সম্পত্তির মধ্যে লক্ষ্মীর একটা ছোট্ট টিনের ট্রাঙ্ক। উপরে লাল গোলাপ ফুল আঁকা। আর সাদা রঙে তার উপর গোল করে লেখা "সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে।" আর রামেরও একটা ছোট্ট কালো টিনের স্যুটকেস।

সরিৎ মেসো বললেন, চাবি কই ?

বড়মামা, মামীমা দেখলেন তাঁদের বাড়ির ব্যাপার তাঁদেরই হাত-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওঁরা কি করবেন ভেবে উঠতে পাচ্ছিলেন না। সরিৎ মেসোকে কিছু বললে যদি মেসো চটে যান ? আফটার অল, এম-পি ভগ্নীপতি। বড়মামা সমানে অস্ফুটে এবং অধৈর্য গলায় বলে যাচ্ছিলেন, সরিৎ ; সরিৎ, সরিৎ।

কিন্তু তখন সরিৎ মেসো অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। লক্ষ্মী এমন কেউই নয় যে, তাকে পার্লামেন্টে নিয়ে গিয়ে পার্লামেণ্টারী প্রিভিলেজ কমিটির সামনে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেওয়াবেন। এ মুখফোঁড় মেয়েছেলে সেখানে গিয়েও কি করবে বিশ্বাস নেই।

সরিৎ মেসো রামকে বললেন, চাবি কই তোর ট্রাঙ্কের ?

বাম বলল, চাবি নেই।

সরিৎ মেসো আবার ঠাস্ করে চড় মারলেন আরেকটা রামকে।

এমন সময় রুমি দৌড়ে এসে বলল, ছোটমেসো, উ্য আর ওভারডুয়িং ইট। লেটস্ নী শিওর হোয়েদার দে আর গিলটি এট অল। ল তুমি নিজের হাতে নিতে পারো না।

ছোটমেসো এদেশীয় রাজনীতিক। ডেঞ্জারাস সিচুয়েশান কাকে বলে তিনি তা জানেন। কোন মীটিংএ বক্তৃতা দেওয়া নিরাপদ আর কোন্ মীটিঙের কাছাকাছি গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে হয় তা তাঁর ভালোই জানা ছিল।

উনি ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে বাইধরকে বললেন, তালা ভেঙে ট্রাঙ্ক তুটো খোল্।

রামের ট্রাঙ্কে তালা ছিলো না। তাই-ই বোধহয় ও বলেছিল চাবি নেই। রামের ট্রাঙ্ক খুলে ওর নিজের জামা কাপড় বেরোল কটা। টুকিটাকি জিনিস। সস্তার আয়না একটা। প্লাস্টিকের সেফটি-রেজর এই-ই সব।

একেবারে নীচ থেকে আমার তুটো পুরোনো চিরুনি ও কয়েকটা ব্যবহৃত টেনিসের বল বেরুলো আর ওর ধুতি-জামা।

ও নিয়ে কেউ কিছু বলল না। কিন্তু তারও নীচে থেকে একটা শাড়ি বেরুলো। শাড়িটা পুরোনো, কিন্তু ছেঁড়া নয়। মাকে ঐ শাড়ি পরতে দেখিনি। রঙীন তাঁতের শাড়ি।

মামীমা হাঁ করে শাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাড়িটা যে মামীমার, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

সরিৎ মেসো বললেন, এই শাড়িটা কার? কার শাড়ি চুরি করেছিস?

রামের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমাদের সামনে লজ্জায়, অপমানে ও মুখ নীচু করে ফেলল।

এমন সময় হঠাৎ মামীমা বললেন, শাড়িটা আমারই সরিৎ। কিন্তু ওর মায়ের জন্যে আমিই ওটা ওকে দিয়েছিলাম। দেশে যাবার সময় নিয়ে যাবে বলে।

রাম এবারে চমকে উঠল। চমকে উঠেই, একমুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, ঐ শাড়িটা…আমি…। আমিই চুরি করেছিলাম। কিন্তু আংটির কথা আমি জানি না।

সরিৎ মেসো বললেন, আ থিফ ইজ আ থিফ। শাড়ি চোর আর আংটি চোরে তফাৎ নেই।

তারপরেই বড়মামাকে বললেন, দাদা, ফোনটা কোথায়?

আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছিল, আর ভোট-চোর? যারা মিথ্যা কথা বলে, ভয় দেখিয়ে, গায়ের জোরে এমন কি রিগিং করে ভোট-চুরি করে, তারা? তারা বুঝি চোর নয়!

খুব জোর সামলে নিলাম নিজেকে। সত্যি কথা বলা চুরি করার চেয়েও বড় পাপ।

বড়মামা বললেন, সরিৎ, থাক থাক, এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে আর থানা-পুলিশ করার দরকার নেই। তুমি বললে, ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নেবে, তা আমি জানি।

সরিৎ মেসোর রাগটা লক্ষ্মীর উপর। বললেন, ফেয়ার এনফ। তারপর লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বললেন, চাবি দে।

লক্ষ্মী তার ছিটের ব্লাউজে ঢাকা বুকের মাঝখান থেকে একটা কালো-কারে বাঁধা চাবি বের করে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, বাবু লাওগো! আমার ছবি লাও।

লক্ষ্মীর ট্রাঙ্ক থেকে অন্য কারু জিনিসই বেরুল না। কিন্তু একটা জিনিসে সরিৎ মেসোর চোখ আটকে গেল। একটি বটতলার কোক শাস্ত্রের বই। অন্য সকলে দেখেও না-দেখার ভান করলেন। আমি মুখ নীচু করে রইলাম গুরুজনদের সামনে।

মেসো হঠাৎ বললেন, সাধে কি মাগী বলেছিলাম তোকে। ডব্‌কা ছুঁড়ি, বিয়ে-থা হয়নি, এই বই দিয়ে তুই কি করিস্?

ঘর-সুদ্ধ সকলে মেসোর এই কথায় অধোবদন হয়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্মী সকলকে চমকে দিয়ে বলল, তোমাদের মত বাবুরা যখন সোহাগ কইর্যো কাছে আইসো তখন তাদেরকে দেখাই গো। কেন? তোমাদের নিজের ঘরে বুঝি সায়েব মেমেদের অসভ্য ন্যাংটো ছবি লাই? তোমাদের দীপবাবু আমাকে বুঝি উসব ছবি দেখায়নি?

মা এবং মামীমা মুখ নীচু করেও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীকে ধমক দিলেন।

এবং বড়মামা সরিৎ মেসোকে নিয়ে জোর করে বেডরুমের দিকে চলে গেলেন। যেতে যেতে বলতে লাগলেন, সরিৎ তুমি সত্যিই একটু ওভার-ডু করে ফেললে পুরো ব্যাপারটা।

সরিৎ মেসো বললেন, নেহাৎ আপনারা ছিলেন, নইলে আমি মাগীর বিষ দাঁত ভেঙে দিতাম।

আঃ সরিৎ। ল্যাঙ্গুয়েজ! ল্যাঙ্গুয়েজ! তুমি নিজে পার্লামেণ্টা-রিয়ান হয়ে এমন আন-পার্লামেণ্টারী ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছ?

লক্ষ্মী ও রাম যার যার লণ্ডভণ্ড স্যুটকেস তুলে নিয়ে নিজেদের ঘরে রাখতে চলে গেল।

আমি আমার ঘরে চলে এলাম। রুমিও পিছন পিছন আমার ঘরে এল। আমার খাটে বসল। তারপর বলল, দিস ছোটো-পিসে ইজ আ ভেরী.ডার্টি-পার্সন। ভেরী ইনডিসেন্ট ইনডিড। ছোটপিসি কি

করে থাকে এর সঙ্গে।

আমি বললাম, দোষ ত তোরই। ওঁরা চলে গেলেই না-হয় আংটির কথাটা বলতিস। তুই যদি নিজে হারিয়ে না থাকিস, বা কোথাও ফেলে না এসে থাকিস তাহলে তোর আংটি এ বাড়িতেই আছে। কেউই চুরি করেনি। আংটি, তাও হীরের আংটি, চুরি করার মত সাহস ওদের নেই।

তারপর বললাম, আচ্ছা রুমি, তুই আজ কোথায় কোথায় গেছিলি মনে কর ত?

কোথায় আবার? আজ ত ক্লাবে যাইনি। রাইদের বাড়ি গেছিলাম। শুধু রাইদের বাড়ি···বলতে বলতেই ও বলল, দাঁড়া ত একবার ওকে ফোন করে আসি।

পাঁচ মিনিট পরে রুমি দৌড়তে দৌড়তে আমার ঘরে ঢুকল। ওর মুখ ফ্যাকাশে, খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল ও।

ও বলল, ঋদ্ধি! হোয়াট আ শেম্।

আমি আমার চেয়ারে বসে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কি?

রুমি চোখ নামিয়ে নিল। তারপর বলল, আংটিটা রাইএর স্টাডিতে ওর টেবিলের উপর আমি নিজেই খুলে রেখে এসেছিলাম। একদম মনে ছিলো না। রাইও ফোন করেনি। বলল, কাল আমাকে সারপ্রাইজ দেবে ভেবেছিল।

এমন সময় রাম আমাব ঘরে ঢুকল। ওর গালে সরিৎ মেসোর পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছিল।

রাম বলল, দাদাবাবু, দিদিমণি, মা তোমাদের খেতে ডাকছেন।

রুমি হঠাৎ রামের কাছে গিয়ে বলল, রাম! আমাকে তুমি মাফ

করে দাও। প্লিজ, পার্ডন মি।

আমি দেখলাম, রাম এক মুহূর্ত অবাক হয়ে থেকেই রুমিকে হাত ধরে ওঠাল। রুমির চোখ ছলছল করছিল। আমি দেখলাম রামের চোখ ভেজা। কিন্তু একটু আগের কান্নার সঙ্গে এই কান্নার কোনো মিল ছিলো না।

রাম বলছিল, ছিঃ ছিঃ, কি বলছ দিদিমণি! ছিঃ ছিঃ, আমি ক্ষমা করব তোমাকে? ছিঃ ছিঃ, কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই। তোমরা আর আমি!

৫

আমি উ্যনিভার্সিটিতে যাচ্ছিলাম। রামকে বললাম, হলুদ প্যান্টটা দে! তার সঙ্গে হলুদ জামা।

রাম আলমারি খুলে ছাই রঙা প্যান্টটা বের করে দিল।

আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, এত বছরে রঙও চিনলি না?

রাম যে রঙ চেনে না আমি জানতাম। যে রঙ-কানা সে রঙ চেনে না, তবুও আমি রোজই আশা করতাম যে, ও একদিন রঙ চিনবে।

রাগ করে আমি নিজেই জামা প্যান্ট বের করলাম।

তারপর বললাম, ডানদিকের ড্রয়ারে হলুদ মোজা আছে, দে।

রাম বাঁদিকের ড্রয়ার ধরে টান দিল।

আমি বললাম, ইডিয়ট।

ও বাঁদিকে দু-নম্বর ড্রয়ার খুলল।

আমি বললাম, জীবনেও তোর কিছু হবে না। তুই একটা আকাট। একটা এ্যালসাসিয়ান কুকুরকে ট্রেনিং দিলে তোর চেয়ে ভাল ট্রেনিং পেত। ভগবান তোর মাথায় গ্রে ম্যাটার বলতে কিছুই দেননি। গোবর, শুধুই গোবর।

রাম জানোয়ারের মত নির্বাক নির্বোধ চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে।

আমাব হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যেদিন ও প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছিল, মামীমা বড়মামাকে বলেছিলেন যে, হাফ-উইট না হলে তোমার কাছে এই মায়নাতে কাজ করতে আসবে কেন?

তবু রাগের সময় রাগ হয়। একজন মানুষের আই-কিউ এত কম কি করে হয় ভেবে পেতাম না আমি।

এমন সময় টেলিফোনটা বাজল।

আমি বললাম, ধর্।

রাম টেলিফোন ধরেই চেঁচালো, হেল্লো। এমন জোরে ও ফোনে কথা বললে যেন মনে হয় নদীর এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের লোকের সঙ্গে কথা বলছে। ওকে কখনও বুঝিয়ে পারা যায়নি।

তারপর বলল, আপনি ধরন।

বলেই, এসে বলল, বিরামবাবুর ফোন।

বিরামবাবু বলে আমি কাউকে চিনি না। বললাম, কার ফোন?

ও বলল, বললাম ত আপনার।

ফোন ধরতেই প্রদীপ বলল, তোর ইক্নমিকসের নোটটা নিয়ে আসিস।

আমি ওর সঙ্গে কথা বলে ফোন রেখে রামের দিকের ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, বিরামবাবু? তোকে এক থাপ্পড় মারব। ফোন করল প্রদীপ

আর বললি বিরাম। তুই, তুই একটা আস্ত জন্তু।

রাম তবু নিজের কথার জেদ ধরে থেকে বলল, হুঁ, তখন বলল বিরাম আর এখন হয়ে গেল প্রদীপ।

ওর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে আমি বললাম, তাড়াতাড়ি একটা লাইন ডাক, আমার তাড়া আছে। চার ছয় শূন্য শূন্য দুই শূন্য।

ও আমাকে ধমকে বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও হুড়বড় কোরো না।

ও কখনও নম্বর শুনে সোজা ডায়াল করতে পারত না। একটা কাগজ নিল, তাতে ওর ভাষায় নম্বরটা লিখল, তারপর কয়েকবার চেষ্টা করেই আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বলল, ইংলিশ।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কে আবার ইংলিশে কথা বলছে?

ফোন ধরে দেখলাম, কর্‌র্‌র্ করে ডায়াল টোন আসছে।

আমি রেগে ওর দিকে তাকালাম।

ও বলল, বললামই ত ইংলিশ। এখন লাইন মিলিব না।

আমি নিজে ডায়াল করে কথা বললাম। তারপর ফোন ছেড়ে বললাম, তোকে দিয়ে কোন্ কাজটা হয় বলতে পারিস? কোন কাজটা পারিস তুই? হতভাগা!

ও আমার উপর উল্টো ঝাঁঝ দেখিয়ে বলল, হঁ। ইংলিশ হলে আমি কি করব?

তখন বুঝলাম, ইংলিশ মানে এনগেজড্। ও কারো কাছে কথাটা শুনে নিজের স্বকীয়তায় ও দুর্মর ওরিজিনালিটীতে এনগেজডকে ইংলিশ করেছে। ও যা করেছে তাই-ই ও চিরদিন করবে এবং করে এসেছে। তর্ক করা বৃথা।

এই অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে অনেক বছর ঘর করলাম। একে না পারি ফেলতে, না পারি সইতে। মাঝে মাঝে মাথায় সত্যিই রক্ত

চড়ে যায়।

ইংলিশ সম্বন্ধে ওকে কিছু বলার আগেই আমাকে তেড়ে বলল, যাও যাও আর দেরী কোরো না, মিনিবাসের লাইন লম্বা হয়ে যাবে।

যাবার সময় বললাম, বইয়ের আলমারীতে কিরকম ধুলো পড়েছে দেখেছিস? কতদিন পরিষ্কার করিসনি?

সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা কথা বলল ও, কালই ত করলাম। কোলকাতা শহরে কী ধুলো তার কি জানবে তুমি?

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বললেই মার খাবি। কাল ত দূরের কথা। গত পনেরো দিনেও এতে হাত লাগাসনি। আজ ভাল করে পরিষ্কার করে রাখবি।

ও বলল, হুঁ হুঁ, পরিষ্কার রোজই করি। তোমাকে বলতে হবে না। এখন যাও ত। আমার এখন মেলা কাজ। আমাকে জ্বালিয়ো না।

সেদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েই প্রদীপ বললো, চল্, আমাদের বাড়ি চল্।

আমি অবাক হলাম। বললাম, হঠাৎ?

বাস থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে এসে গলির মধ্যে ওদের বাড়ি। ও থাকত বেকবাগানে।

প্রদীপই চিরদিন আমাদের বাড়ি এসেছে। একা এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্য আমাদের বাড়ি ওর ফেরার পথে পড়ে বলে। কিন্তু আমার মনে পড়ে না ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর প্রদীপ কখনও একদিনের জন্যেও আমাকে ওর বাড়ি যেতে বলেছে, বা নিয়ে গেছে জোর করে।

আবার বললাম, কি ব্যাপার রে?

ও বলল, কোন ব্যাপার নেই। চল না। গরীব বন্ধু বলে কি

যেতে নেই ?

আমি বললাম, সচ্ছল মামাবাড়িতে থাকলেই যদি কেউ বড়লোক হয়ে যায় তাহলে তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দারোয়ানও বড়লোক !

দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে আঙুলে ব্যথা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে এসে দরজা খুলল। একটা ছেঁড়া, নোংরা খাকি প্যান্ট পরা। কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা প্যান্টটা। খালি গা। মেঝেতে পড়ে ঘুমোচ্ছিল।

প্রদীপ বলল, মেরে তোর দাঁত ভেঙে দেবো। কাজের মধ্যে শুধু ঘুম। দরজা খুলতে এক ঘণ্টা লাগল ?

ছেলেটা কথা বলল না। ছেলেটার চোখ গর্তে-বসা, হাড় জিরজিরে গরুর মত চেহারা, বড় বড় চোখের পাতা মেলে তাকিয়ে থাকল। কোনো জবাব দিলো না।

প্রদীপ বলল, মা নেই ?

না। মামাবাড়ি গেছেন।

কাকীমা ?

সিনেমায়।

শীগগীরি চা কর দু কাপ আর মোড়ের দোকান থেকে আলুর চপ নিয়ে আয়। বলেই, একটা টাকা বের করে দিল ওকে।

আমাকে বলল, কিছু মনে করিস না। তোদেরও বাড়ি আর আমাদেরও বাড়ি। বাড়িতে কাউকে আনতেই লজ্জা করে।

তারপর বলল, তুই বোস, আমি উপর থেকে দুটো ফোন সেরে আসছি।

আমি ভাবছিলাম অবাক হয়ে, বন্ধুত্বের সঙ্গে বাড়ির অবস্থার

সম্পর্ক কোথায় এবং কতটুকু। হঠাৎই আমার সহপাঠীকে আমার খারাপ লাগল ঐ কথাটা বলার জন্যে।

ওদের বাইরের ঘরটা ছোট, শ্রীহীন। খুবই ছোট। দেওয়ালে একটি লাস্যময়ী মেয়ের ছবিওলা ক্যালেণ্ডার। ঘরের কোনায় শতরঞ্চি পাতা তক্তপোষ। দুটো চেয়ার। কাঠের একটা টেবল। টেবলক্লথহীন। জলের গ্লাস ও চায়ের কাপ রাখার দাগে দাগে নোংরা। ওর কাছেই শুনেছিলাম, প্রদীপের বাবা সবকারী অফিসের ইউ-ডি-সি। ওর কাকার একটা ছিট কাপড়ের দোকান আছে কালীঘাটে না কোথায় যেন। হকার্স কর্ণারে। কাকার ছেলেমেয়ে নেই।

প্রদীপ মা-বাবার একমাত্র সন্তান। প্রদীপ পড়াশুনায় সাদামাটা। ও এক বড় রাজনৈতিক দলের ছোট নেতা। দুনিয়ার মেহনতী মজদুরদেব জন্যে ও কেঁদে কূল পেতো না। দারুণ সুরেলা ও ঝাঁকিদেওয়া প্রফেশানাল গলায় ও বক্তৃতা দিত। মিছিলে ধ্বনি দিত, শ্রেণীশত্রু নিপাত যাও ; নিপাত যাও। মুঠি পাকিয়ে বলত, এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।

আমি ওর মুখেই শুনেছি যে, ওব বাবাও তাঁর অফিসের ইউনিয়নের চাঁই ছিলেন। এবং এখনও আছেন।

প্রদীপ আমাকে আলাপ হওয়ার পর থেকেই বুর্জোয়া বলত। বলত, তোরাই দেশের শত্রু। আমি হাসতাম। আমি মনে মনে জানতাম যে, আমি নিশ্চয়ই বুর্জোয়া। কিন্তু···

প্রদীপ ফিরে এল। বলল, তোকে বসিয়ে রাখলাম অনেকক্ষণ।

বললাম, ঠিক আছে।

ও বলল, তুই একটু বোস। বাবা এসে পড়বেন। তোর সঙ্গে বাবার কথা আছে।

আমি অবাক হলাম। বললাম, তোর বাবার সঙ্গে আমার কথা? কি কথা? এর আগে ত কখনও আলাপই করিয়ে দিলি না। আচ্ছা লোক তুই যা হোক।

ও বলল, এই-ই ত আলাপ হবে। কি কথা তা আমি জানি না। বাবা এসেই বলবেন। এসে পড়লেন বলে।

ছেলেটি আলুর চপ নিয়ে এলো ঠোঙা করে। টেবিলের উপর ঠোঙাসুদ্ধ রেখে গেল।

প্রদীপ বলল, চা করে আন। এক্ষুনি।

ও অস্ফুটে বলল, আসছি।

আমি প্রদীপকে শুধোলাম, ওর নাম কি রে?

প্রদীপ বলল, রাম।

আমি জানতাম যে ওর নামও রাম হবে। ওদের সকলের একই নাম।

আমার পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের বাড়িতেই একজন বা একাধিক রাম আছে। ছোটবেলা থেকে এই রামদের দেখে আসছি। আর আমাদের নামও এক। আমরা রাবণ।

আমি বললাম, কত মাইনে পায় রে ছেলেটা? ছেলেটা বেশ!

প্রদীপ বলল, বেশ? পাজীর পাঝাড়া।

তারপর বলল, মাইনে দশ টাকা। কিন্তু খাওয়া-পরা পায়।

পরাটা যে কেমন পায় তা আমি স্বচক্ষেই দেখলাম। খাওয়াটাও অনুমান করতে পারলাম সহজে।

একটু পরে প্রদীপের বাবা এলেন। ট্যাক্সি করে। গায়ে সাদা টেরিলিনের পাঞ্জাবি। সোনার বোতাম লাগানো, হাতে পলার আংটি, পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করে সিগারেট

ধরালেন। আমাকে দেখিয়ে প্রদীপকে বললেন, ওকে কিছু খাইয়েছিস ?

এই ত ! বলে, আলুর চপের ঠোঙাটা দেখালো প্রদীপ।

প্রদীপের বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন, তুই কি রে ? আশুর দোকান থেকে ছানার জিলিপি আর ফুলকপির সিঙাড়া আনিয়ে দিলি না কেন ?

বলেই, পাঁচ টাকার নোট বের করলেন একটা। তারপর প্রদীপকেই বললেন, রাম নেই ? ত তুই-ই যা।

প্রদীপ বলল, রাম আছে, চা করছে।

আমার মনে হল, নিজে হাতে শালপাতার ঠোঙা করে দোকান থেকে মিষ্টি আনতে ওর সম্মানে লাগছে। কিন্তু ও গেল তবুও।

ও বেরিয়ে যেতেই রাম চা এনে দিল।

প্রদীপের বাবা চা মুখে দিয়েই বললেন, ইস্‌স্‌ চিনির শরবৎ। তোকে কতদিন বলেছি হারামজাদা এত চিনি দিবি না। চিনি কিনতে ত পয়সা লাগে না ? চিনি বুঝি তোমার বাবার সুগার মিল থেকে আসে ? তুমি কী বুঝবে মাণিক কত প্যাডিতে কত রাইস ?

রাম মুখ নীচু করে থাকল। বলল, আরেক কাপ করে আনব ?

শীগগীর নিয়ে আয়। পরে আবার করবি দাদাবাবু ফিরলে।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে উনি একটু চুপ করে থেকে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন। তারপর জরুরী গলায় বললেন, ঋদ্ধি, প্রদীপ আসার আগেই ব্যাপারটা বলে নিতে চাই।

আমি বললাম, বলুন।

ভাবতেই পারছিলাম না, কী এমন কথা থাকতে পারে প্রদীপের বাবার আমার সঙ্গে।

উনি বললেন, তোমাদের সঙ্গে পড়ে, মধুমিতাকে চেনো তুমি ?

মধুমিতা ? আমি চমকে উঠলাম। বললাম, হ্যাঁ। চিনি। কেন বলুন ত ?

মধুমিতার সঙ্গে প্রদীপের বন্ধুত্বের কথাটা জানো ?

বিলক্ষণই জানতাম। মধুমিতাকে আমরা মমি বলে ডাকতাম। এবং ওর সঙ্গে প্রদীপের বন্ধুত্বটা যে নিছক বন্ধুত্ব নয় তা আমার অজানা ছিলো না।

আমি বললাম, হ্যাঁ। ও ত আমাদের সকলেরই বন্ধু।

ইচ্ছে করেই আসল কথাটা এড়িয়ে গেলাম আমি। উনি যদি প্রদীপের বিরুদ্ধে আমাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে চান আমি তাতে রাজী ছিলাম না।

কিন্তু উনি অন্য কথা বললেন। বললেন, মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো। তাছাড়া রাজনীতিও করে। ওর বাবার অবস্থা খুবই ভালো। লোহা-লক্করের ব্যবসা আছে। মধুমিতা বোধহয় ওর বাবাকে কিছু বলেছে এবং ওর বাবার বিশেষই আগ্রহ। আফটার অল আমরা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, নামকরা ফ্যামিলি কোলকাতার। আর মধুমিতারা জাতে অত্যন্ত নিচু।

তারপর সিগারেটে আরেক টান দিয়ে বললেন, ওঁর নিজেরও পলিটিকসে আসার খুব ইচ্ছে। অনেক টাকা বানিয়েছেন। গত বছর ইলেকশানের সময় আমার কাছে এসেও ছিলেন টিকিটের জন্যে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন আমাদের পার্টির ব্যাকিং নিয়ে। কিন্তু আমরা ত কমিটেড লোক ছাড়া কাউকেই দিই না ওসব। তুমি জানবে···।

প্রদীপের বাবা চায়ে আরেক চুমুক দিয়ে বললেন, উনি প্রদীপকে

লেক গার্ডেনস-এ নতুন বাড়ি করে দেবেন। জমি কেনাই আছে। গাড়িও দেবেন। আমি আর প্রদীপের মা বুড়ো বয়সে ওখানে একটু আরামে থাকতে পারব। আমার ভাই আর ভাই-এর স্ত্রী এখানেই থেকে যাবে।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, বুঝলে হে, চিরদিন ত সংগ্রামই করলাম, শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে। ক্লাসলেশ সোসাইটী গড়ার জন্যে··· । শেষ বয়সটা একটু··· ।

আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, আমি কি করতে পারি বলুন ?

উনি বললেন, সেই কথাতেই আসছি। মধুমিতার বাবা একটা স্টীল রোলিং মিলের লেটার অফ ইনটেন্ট-এর জন্যে এ্যাপ্লাই করেছেন। এই ব্যাপারে তোমার এম-পি মেসোমশাইকে বলে যদি দিল্লীতে ওঁর এই কাজটা করিয়ে দিতে পারো তুমি, তাহলে আমার হবু বেয়াইয়ের বড় উপকার হয়। টাকা খরচ করতেও ওঁরা রাজী আছেন। তুমি শুধু তোমার ছোটমেসোর সঙ্গে এখানে অথবা দিল্লীতে একটা এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট করিয়ে দেবে। এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পর ওঁরা যা করার করবেন। ওঁরা বোকা নন। জানেন যে টাকা না ঢাললে টাকা আসে না ঘরে।

আলুর চপটা খেয়েই অম্বল অম্বল লাগছিল আমার। এখন কেমন গা গুলোতে লাগল।

আমি এমব্যারাসড হয়ে বললাম, ছোটমেসো আমাকে বিশেষ পছন্দ করেন না। ছোটমাসীও নন। আমার সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ নেই ওঁদের। অনেকদিন আমি ওঁদের বাড়ি যাইও নি।

প্রদীপের বাবা অবাক হলেন। বললেন, কেন ? তোমাকে পছন্দ না করার কারণ ?

আমি বললাম, এটা আমাকে দিয়ে হবে না। আমার সত্যিই অসুবিধা। আপনাদের পার্টিরই কোনো এম-পিকে ধরে করুন না।

উনি বুদ্ধিদীপ্ত দারুণ এক হাসি হাসলেন। বললেন, তুমি ছেলেটা ভালো, কিন্তু বড্ড বোকা।

তারপর বললেন, আমার নিজের পার্টির এম-পি-দের কাছে আমি কোন্ মুখে যাবো। তাঁরা করে হয়ত দেবেন। পার্টি ফাণ্ড বা ফাণ্ডের নাম করে কিছু টাকা নেবেন হয়ত। কিন্তু আমি তো একসপোজড হয়ে যাবো। আফটার অল আমার বেয়াই আমার শ্রেণীশত্রু ত বটেই। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ; ওঁর কারখানায় স্ট্রাইক হয়েছিল, সেই সময়। না, না। তাই-ই যদি সম্ভব হত তাহলে আর আমি তোমাকে এত করে বলব কেন?

আমি বললাম, আমার যে ঐ অসুবিধা।

উনি বললেন, তুমি কি তোমার বন্ধুর ভালো চাও না? তুমি কী চাও আমাদের মত অভাবী কেরানী হয়েই প্রদীপও সারা-জীবন কাটাক?

তারপরই উনি হঠাৎ বললেন, ঋদ্ধি, তুমি যদি কোনো কমিশন চাও এই কাজ করে দেওয়ার জন্যে, তাও পাবে। আমার বেয়াই বিজনেসম্যান। কাজ হলে উনি খরচে কার্পণ্য করবেন না।

আমি স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম।

বললাম, আমার ছোটমেসো সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু উঁচু নয়। আপনি এক কাজ করুন, আমি এক্ষুনি ছোটমাসীকে বলে দিচ্ছি। আপনি ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। উনি একটা এ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট নিশ্চয়ই করে দিতে পারবেন।

উনি বললেন, বাস। বাস। আর কিচ্ছুর দরকার নেই। এখুনি

চলো, শোবার ঘরে আছে টেলিফোন।

ছোটমাসীকে পেয়েও গেলাম। প্রদীপের বাবার নাম করে বললাম ছোটমেসোর সঙ্গে এঁর বিশেষ দরকার। এতে ছোটমেসোরও লাভ হবে।

ছোটমাসী বললেন, তোর মেসোর লাভ নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না।

আমি বললাম, আমি ঘামাচ্ছি না, যিনি যাবেন তিনিই ঘামাচ্ছেন। তুমি শুধু এ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে দিও।

ছোটমাসী বললেন, কাল আমি সাউথ-এ যাচ্ছি। কোভালাম বীচটা দেখা হয় নি। তোর মেসো দিল্লী থেকে ওখানে আসবেন সোজা। তুই ভদ্রলোককে আজই পাঠা বিকেল ছটা নাগাদ।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তারপর বললাম, আমার নাম শুনে আবার তাড়িয়ে দিও না যেন। তোমাদের পরিচয়টা ত বড় কম পরিচয় নয়। লোকে জানে তাই আমাকে ধরে। প্লিজ, যা পারো কোরো।

ছোটমাসী তারপর মায়ের, মামীমার, বড়মামা, রুমি সকলের খোঁজ নিলেন। তারপর বললেন, ছাড়ছি রে।

প্রদীপের বাবা আমাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বেঁচে থাকো বাবা।

আমরা নীচে নামতেই প্রদীপ এলো ছানার জিলিপি ও সিঙ্গাড়া নিয়ে।

আমি বললাম, আমার শরীর গুলোচ্ছে কেন জানি না। আমি আর কিছু খাবো না।

এমন সময় রাম চা নিয়ে এসেই প্রদীপের বাবাকে বলল, বাবু

আমার বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে আমার মায়ের খুব অসুখ, মা বোধহয় আর বাঁচবে না। তিনদিন ছুটি চাই।

উনি খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, ছুটি চাইলেই ছুটি পাওয়া যায়? বদলীতে অন্য লোক দিয়ে যাও। তোমাদের মা-বাবারা ইচ্ছেমত মরে, ইচ্ছেমত বেঁচে ওঠে। আমার সঙ্গে চালাকি করিস না রাম। যদি বদলীতে কোনো বিশ্বাসী লোক দিয়ে যেতে পারিস ত যা। নইলে আর আসতে হবে না। পয়সা ফেললে লোকের অভাব হয় না। তোর মত বহু লোক ফুটপাথে শুয়ে না-খেয়ে রয়েছে। বেশী জ্বালাস না আমাকে। জরুরী কথা বলছি। এখন ভাগ্ এখান থেকে।

রাম কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, আমার দাদা লিখেছে, মা কিন্তু আর সত্যিই বাঁচবে না বাবু। আজই বালীগঞ্জ স্টেশান থেকে ট্রেন ধরে চলে যেতাম রাতে—আপনাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে।

তুই গেলি এখান থেকে। উনি ভীষণ রেগে বললেন।

রাম তখনও দাঁড়িয়ে থাকল।

প্রদীপ বলল, তোর সাহস ত কম নয়?

রাম ভয়ার্ত চোখে একবার প্রদীপের দিকে চেয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। উনি বললেন, একটাও ছানার জিলিপী খাবে না বাবা? বড় ভালো করে এরা।

আমি বললাম, আমার শরীর খারাপ লাগছে। আমি আজ উঠব।

বেশ! বেশ! আবার এসো বাবা।

প্রদীপ আমার সঙ্গে সঙ্গে এলো।

বলল, বাবার সঙ্গে কি কথা হল রে?

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, তুই কিছু জানতিস না ?

ও বলল, কিছুটা জানি। বাবাকে বলেছিলাম যে, তুই নিশ্চয়ই কাজটা করবি। মানে, করতে পারবি।

তারপরই বলল, কি হলো ? হলো কিছু ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলাম।

প্রদীপ পাশে যেতে যেতে বলল, কি রে ? কি হল তোর ?

বললাম, কিছু না। তারপর ওকে বললাম, তোর সবই হবে। লেক গার্ডেনস-এ বাড়ি, গাড়ি, ডিরেকটরশিপ, মমি ; সবই তোর হবে একদিন। খুশী ?

প্রদীপ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ওর হাতে আমার হাত চেপে ধরে কি যেন বলতে গেল, তারপর কিছুই বলল না।

আমি বললাম, চলি রে।

বলেই বাসে উঠে পড়লাম।

৬

সেদিন বাড়িতে ফিরেই দেখি রাম হাউ হাউ করে কাঁদছে, হাতে একটা টেলিগ্রাম। বড়মামা, মামীমা ও মা ঘিরে বসে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

মা বললেন, আহা ! বেচারার বাবা মারা গেছে।

বড় মামীমা ও মা ওকে টাকা দিলেন। আমিও যা পারলাম দিলাম। ও যখন ওর স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে রাত আটটার গাড়ি ধরবে বলে আমাদের সকলের কাছে বিদায় নিতে এল তখন মামীমা

বললেন, কবে ফিরবি ?

বাবার কাজ হয়ে গেলেই ফিরে আসব।

মা বললেন, দেরী করিস না।

ও চলে যাবার পরদিন থেকেই ও যে কি কাজ করত, বাড়ির সকলে যে ওব ওপর কত নির্ভরশীল, ওর বিশ্বস্ততার উপরে কতখানি বিশ্বাসী তা প্রত্যেকেবই কাছে ভাস্বর হয়ে উঠল। ওর উপরে বাড়ি ছেড়ে সকলে চলে গেলেও কোনো চিন্তা ছিলো না কারোই।

রুমি যেদিন চলে গেল সেদিন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর ফ্লাইট মাত্র আট ঘণ্টা লেট ছিল। আমরা সকলেই গেছিলাম এয়ার পোর্টে ওকে ছাড়তে। আমরা ওকে সী-অফ্ ‌করে যখন ফিরলাম তখন রাত তিনটে। রাম তখনও গেটের সামনে বসেছিল।

ওর একটা আশ্চর্য অভ্যেস ছিল। সব কাজ শেষ না হলে ও খেতে পারত না। খাওয়ার আগে বারো মাস এমন কি শীতেও চান করত। জামাকাপড় ছেড়ে লুঙি পরত। তারপর খেয়েই ধরাশায়ী। খাওয়ার পর ও এক মুহূর্তও বসে থাকতে পারত না। ঠাকুর এবং অন্যান্য লোকজন কেউই ওর এই অভ্যাসের কারণে নিজেদের অসুবিধে ঘটাতো না। আমাদের সকলের খাওয়া হয়ে গেলেই তারা যার যার মত খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ত। রামের খাবার কলাই-কবা থালায় বাড়া থাকত, সানকী-ঢাকা ওর ঘরের মেঝেতে। তেলাপোকা ও ইঁদুর এসে ঘোরাঘুরি করত থালার চারপাশে। তবুও কখনও ওকে সব কাজ শেষ হওয়ার আগে খাওয়ানো যায় নি।

বড়মামার যেবার হার্ট-এ্যাটাক হল, সেবার নার্সিংহোমে ওঁকে শিফট করানোর আগের চব্বিশ ঘণ্টা রাম এক গ্লাস জলও খায় নি। যেভাবে ও সমানে দৌড়াদৌড়ি করেছিল সারা রাত এবং সকাল

দশটা পর্যন্ত তা আমি জানি। বড়মামাকে ও নিজের বাবার মতই দেখত। সব ব্যাপারটাই, হিন্দুস্থান পার্কের এই বাড়ির সব দায়িত্ব যেন ওরই একার পিতৃদায় এমনভাবে ও সব কিছুর ভার নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছিল স্বেচ্ছায়। এই স্বেচ্ছারোপিত দায়িত্বের মধ্যেই ওর কাজের সমস্ত জব-স্যাটিসফ্যাক্‌শান নিহিত ছিল।

বড়মামী একজন লোক এনে দিলেন। ওর বোনের বাড়ির চাকরকে বলে। সাত দিনের দিন সেই বিশেষ আই-কিউ সম্পন্ন চালাক চতুর ছেলেটি বড়মামার রোলেকস্ রিস্টওয়াচ, ট্রানজিস্টর, মামীমার পুজোর সোনার থালা, মায়ের একটা টেবল ক্লক এবং আমার টেপ রেকর্ডার নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। পুলিশে ডায়রী করা হল। কিন্তু কিছুই হল না।

কিছুই হয় না এখানে। যার যার মাল-জানের দায়িত্ব যার যার নিজের নিজের। শুধু ট্যাকস্‌টা ঠিকই দিতে হয়। শুধু বুকনী ও চোখ-রাঙানীর শেষ নেই।

চোর যে ধরা পড়বে না তা আমরা জানতাম। আমরা কোনো মিনিস্টারকে চিনি না। সরিৎ-মেসো থাকলে হয়তো কিছু হত। প্রদীপের বাবাকে বললেও হয়তো হত। কিন্তু···

ঐ নতুন লোকটা চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার পর আর নতুন লোক রাখা হল না সাহস করে। প্রত্যেকের বড়ই অসুবিধে হতে লাগল। রাম বারো দিনের ছুটি নিয়ে গেছিল। পনেরো দিন হয়ে গেল।

আমার বইয়ের আলমারী ধুলোয় ভর্তি। গোছাতে গিয়ে দেখি যে সমস্ত বই লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে রাম। বাংলা বইয়ের মধ্যে ইংরিজী। কবিতার বইয়ের তাকে ইতিহাস। আর্ধেক বই উল্টো করে

রাখা। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অটোবায়োগ্রাফীর তিনটে ভল্যুম তিন জায়গায়। হেমিংওয়ের মেন উইদাউট উইমেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নীল নির্জনের পাশে। রমাপদ চৌধুরীর গল্প-সমগ্র, সাংখালার টাইগার এবং জিম করবেটের জাংগল লোর-এর মধ্যিখানে। একেবারে হতাশ অবস্থা।

বইগুলো গোছাতে গোছাতে রামের উপর যেমন মনে মনে রাগ করছিলাম, তেমন ও যে নেই, ডাকলেই যে ও সাড়া দেবে না, ওকে যা মন চায় তাই বলে গালাগালি করতে পারবো না; রাতে খাবো না বললে যে ও আমার সম্ভাবনাহীন শাশুড়ীর মত আদর করে, জোর করে আমাকে খেতে বাধ্য করবে না ঐ সব জানা মনকে বড় পীড়িতও করছিল। মনের এমনই অবস্থা যেন রাম মরেই গেছে।

জামা-কাপড় ডাইং-ক্লিনিং-এর দোকানে দিচ্ছিল গিদাইয়া। দশ দিনের বিল হল দেড়শো টাকা, সারা বাড়ির। বেড-কভার নোংরা, বড়মামার স্লিপিং স্যুটে গন্ধ, মশারিতে ঝুল, বসবার ঘরের কার্পেটে ভিক্টরের গায়ের লোম ও জিভের লালা। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা।

তিনদিন পর বড়মামী বড়মামার বেডরুমে এমার্জেন্সী মীটিং-এ ঠিক হল যে আমাকে সরেজমিনে তদন্তে যেতে হবে। এও আবিষ্কৃত হল যে রাম এ বাড়িতে দশ বছর কাজ করছে কিন্তু ছুটি নিয়েছে কুল্লে দু মাস। পঁয়ত্রিশ টাকায় ঢুকেছিল। দশ বছরে ওর মাইনে বেড়ে হয়েছে পঞ্চাশ। টাকার দাম কমে গেছে যদিও বহুগুণ। কিন্তু তা বলে বড়মামার রোজগারও বাড়ে নি। যদিও আমিও এখন চাকরি করছি। নেহাতই সাদামাটা একটা চাকরি। তবে ভবিষ্যৎ

ভাল। যদি ভবিষ্যৎ বলে কিছু থেকে থাকে আমার।

মীটিং-এ স্থির হল, আমাকে কালই যেতে হবে রামের গ্রামে। রামকে ফিরিয়ে আনতে হবে। ওকে এবার থেকে মাসে একশ টাকা করে দেওয়া হবে, যেটা রাম না এলে এক মাসে ধোপার যা হিসাব হত তার চারভাগের একভাগ। অন্য সব ছেড়ে দিলেও। আমার এ্যাসাইনমেন্ট হল এই-ই যে, যেন-তেন প্রকারেণ ওকে সঙ্গে করে আমার নিয়েই আসতে হবে।

নতুন চাকরি। পুজোয় ছুটি নেবো হয়ত কদিন। কোথাও যাবার জন্যে। তারপর আবার এই ঝামেলা। ভাবলাম শনি রবির সঙ্গে একদিন ছুটি নেব।

যাবার দিনে বড়মামা, রামের বিধবা মার হাতে দেওয়ার জন্যে আরও একশ টাকা দিলেন আমাকে আলাদা করে। পুরী একসপ্রেসে কটকের টিকিট কেটে শুক্রবার রাতে চেপে বসলাম।

রুমি থাকলে রুমিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতাম। ও রাফিং করতে খুব ভালবাসে। কিন্তু ও ত এই হতভাগা অন্ধকার দেশ ছেড়ে আলোর সন্ধানে মাইগ্রেটরী হাঁসের মত উড়ে গেছে। বসন্ত শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের শেষ বেলাতে শীতে যদি ফেরে।

কটক ভোরে নেমে রিটায়ারিং রুমে চান করে রেস্টুরেন্টে চা-টা খেয়ে বাস ধরলাম। ঢেন্‌কানল হয়ে অঙ্গুল হয়ে করত্‌পটা পেরিয়ে নুয়াকোট বলে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ও পাহাড় ঘেরা একটি ছোট্ট গ্রামের সামনে যখন বাস থেকে নামলাম তখন সন্ধ্যে হবো হবো। গরু-বাছুর, ছাগল-মুরগী ফিরে আসছে যে যার ঘরে। প্রায় অর্ধনগ্ন একপাল ছেলেমেয়ে গ্রামের পথে যার যার খড়ের ঘরের সামনে চেঁচামেচি লাফালাফি করছে। এতটুকু গ্রাম। অথচ এত ছেলে-

মেয়ে! একেবারে পপুলেশান একসপ্লোশান।

কাঁধে ঝোলা নিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ম্লান পটভূমিতে আসন্ন সন্ধ্যায় একটি শহুরে পোশাকের মানুষকে গ্রামের পথে হেঁটে যেতে দেখে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ও মেয়েরা কৌতূহলী চোখে আমার দিকে চাইছে। নিজেদের ভাষায় কী সব বলাবলি করছে। এখানের মেয়েরা অদ্ভুতভাবে শাড়ি পরে। একটা ছোট মোটা শাড়ি আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে বুক এবং কোমরের কাছটা ঢাকে। হাঁটুর একটু নীচে পড়ে সে শাড়ি। অন্য কোনোরকম অন্তর্বাসই নেই।

একটু গিয়েই একজন পুরুষের সঙ্গে দেখা হল। সে পথের পাথর-বাঁধানো কালভার্টের উপরে বসে হাঁটুতে পাক দিয়ে দিয়ে মাছধরা খেপলা জাল বুনছিলো।

তাকে বললাম, দশরথ সাইয়ের বাড়ি কোনটা?

লোকটা জাল বোনা থামিয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, সিয়াড়ে।

আমি বললাম, দশরথ সাই ত মরে গেছে। তার ছেলে রাম সাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে?

লোকটা অবাক হল। শুধোল, আমি কি পুলিশের লোক?

আমি বললাম, না। রাম সাই কোলকাতায় আমাদের বাড়িতে কাজ করে।

লোকটা একটা ঝাঁকি দিয়ে নামল কালভার্ট থেকে। তারপর বলল, ই বাটে আসন্তু।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে কিছুটা নিয়ে গিয়ে একটা খড়ের চালাঘরের সামনে আমাকে দাঁড় করাল ও। তারপর ডাকল রাম্ব ভাই; রাম্ব ভাই।

ভিতর থেকে রামের গলা শোনা গেল। কার সঙ্গে উঁচু গলায় সে কথা বলছিল। মুরুব্বীর মত এমন স্বরে আমাদের বাড়িতে কখনও ওকে কথা বলতে শুনিনি। লোকটির ডাকে উত্তর দিয়ে রাম ছোট্ট কাঠের দরজা দিয়ে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এসে মাটির দাওয়ায় ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই আমাকে দেখে প্রথমে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। পরক্ষণেই নীচু হয়ে বসে দু হাত দিয়ে দু পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করল। আমাদের মত শুধু ডান হাত দিয়ে প্রণাম করল না। ওর মুখ দেখে মনে হল বিস্ময় ভয় ও আনন্দ ওর চোখে মুখে মাখামাখি হয়ে আছে।

আমি বললাম, তোর বাবার কাজ হয়ে গেছে? মাথা ন্যাড়া করিসনি?

যে লোকটা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, সে হেসে উঠল অদ্ভুত শব্দ করে তারপর বলল, মুই জীবি।

বলেই চলে গেল।

এমন সময় একজন বৃদ্ধ লোক, বেঁটে খাটো, মাথাভর্তি সাদা চুল; কিন্তু শক্ত সমর্থ চেহারা নিয়ে বাইরে এল।

রাম তার দিকে ফিরে বলল, বাপ্‌ব, দাদাবাবু আস্বিলা!

সেই বৃদ্ধও আমাকে রামের মত করে প্রণাম করতে এগিয়ে এল। আমি লজ্জায় পা সরিয়ে নিয়ে তার হাত ধরলাম।

রামের লজ্জিত মুখ দেখেই বুঝলাম যে ব্যাটাচ্ছেলে ডাহা মিথ্যা কথা বলেছে। এই-ই রামের বাবা দশরথ। মরা ত দূরের কথা তার কোনো অসুখ যে পনেরো দিনের মধ্যে হয়েছিল এমন কোনো লক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই তারা বাবা ছেলে

দুজনে মিলে আমাকে হাত ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা ঘরে রান্না হচ্ছে। উনুনের আগুনের আঁচের লাল আভা নাচানাচি করছে ঘরের দেওয়ালে। মধ্যে একটা ছোট্ট উঠোন। গরু বাঁধা আছে একটা। সঙ্গে বাছুর। পিছন দিকে একটু বেড়া দেওয়া। সামান্য তরি-তরকারী লাগানো হয়েছে বলে মনে হল। ভিতরের বারান্দায় একটা কুপী জ্বলছে। এ-ছাড়া আর কোনো আলোই নেই।

রাম ওর মাকে ডাকলো। আর ছোট ভাই শত্রুঘ্নকে। মা এসে ঘোমটার আড়াল থেকে হাত জোড় করে নমস্কার করতেই রামের বাবা কী যেন বলে উঠল। তখুনি লজ্জিত হয়ে রামের মাও এসে আমাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। দু পা পিছিয়ে গেলাম আমি।

রামকে বললাম, কী রে! আমার মা তোর মা হলে, তোর মা আমার মা নয়?

দশরথ অধোবদনে আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে বলল, তুমি হলে গিয়ে বাবু, মনিব। তোমরা আর আমরা কী এক হলাম।

কী বলব ভেবে পেলাম না।

তাড়াতাড়িতে একটা ঘর খালি করা হল আমার জন্যে। নারকোল দড়ির চৌপাইয়ে রাম আমার ব্যাগ থেকে চাদর ও রবারের বালিশ বের করে বিছানা করল তাড়াতাড়ি। তার নীচে একটা পুরনো শাড়ি এনে পেতে দিল।

রাগের গলায় বলল, এখানে কী তোমার মত ভদ্দরলোকে থাকতে পারে? আগে বললে ডাকবাংলোতে চৌকিদারকে বলে বন্দোবস্ত করতাম। কালই তাই করব। আজ রাতটা কষ্ট করে

কাটাও কোনোমতে।

আমি বললাম, কাল ত চলেই যাব। এখানেই থাকব। তোর বাড়ি থাকতে ডাকবাংলোয় থাকব কোন দুঃখে?

ততক্ষণে রামের মা একটু মুড়কি এনে দিয়েছিলো পিতলের একটা গোল বাটিতে। ঝকঝকে করে মাজা পিতলের ঘটিতে করে জলও।

এমন সময় বৃষ্টি নামল। ঝম ঝম করে নয়, ফিস্‌ফিস্‌ করে। রাম আরেকটা কুপী জ্বালিয়ে নিয়ে ঘরে এল।

ছোট্ট ঘরের মধ্যে কাঁপা-কাঁপা আলোতে রামকে দেখছিলাম আমি। রামকে অনেক লম্বা শালপ্রাংশু বলে মনে হয়েছিল। এই রাম আমার চেনা নয়। ওর পরনে গেরুয়া রঙের খাটো ধুতি। খালি গা। কিন্তু হাতে রিস্টওয়াচটা ঠিকই বাঁধা। তাড়াতাড়িতে আমাকে দেখার পরও খোলার সময় পায়নি। হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে ও ওটা খুলে ফেলতে গেল। কিন্তু ধমক খেয়ে থামল।

মুড়কি খেতে খেতে বললাম, কী রে? মিথ্যেবাদী!

রাম মুখ নীচু করে থাকল। বলল, আর সাতদিন পরেই চলে যেতাম।

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বলে এলি কেন?

রাম বলল, মিথ্যা না বললে যে ছুটি পাওয়া যায় না। আমি এলে যে তোমাদের কত অসুবিধা হয় তা কি আমি জানি না?

আমি ভাবছিলাম, চাকরী সংক্রান্ত ব্যাপারে মিথ্যা কথা আমিও বলি রামের মত। আমার অনেক সহকর্মী টি-এ বিল ইনফ্লেট করে, কেউ অন্যের গাড়িতে গিয়ে ট্রেনে যাতায়াতের বিল করে—অনেক তুচ্ছতর কারণে। রামের মিথ্যা বলার পিছনে যে যুক্তি ছিল সেটা তুচ্ছ নয়।

রাম চুপ করে তাকিয়ে ছিল আমার মুখের দিকে।

আমি বললাম, তোর আর ভাইয়েরা কোথায় ?

রাম বলল, ভাইয়েরা এখানে থাকলে আর ভাবনা ছিল কি ? মেজলা ভাই লক্ষ্মণ চৌতুয়ারের কাগজের কলে ভাল চাকরি করে। বোনাস পায়, কোয়ার্টার পেয়েছে। ওখানেই একজন সম্বলপুরী মেয়েকে বিয়ে করে থাকে। বাড়িতে আসেও না, টাকাও পাঠায় না। সম্পর্কই রাখেনি।

ভরত ? লক্ষ্মণের পরের ভাই ?

সে ত লেখাপড়া শিখেছিলো। বাবা তাকেই একমাত্র লেখাপড়া শিখিয়েছিলো। সে দশ ক্লাস অবধি পড়ে ফুলবনী পোস্ট অফিসে কাজ করে। সেও একটি আদিবাসী মেয়েকে বিয়ে করে ওখানেই ঘর সংসার করছে। বাবা-মায়ের খোঁজও নেয় না।

আমি বললাম, তুই হঠাৎ বাবা-মরা টেলিগ্রাম দিয়ে এখানে এলি কেন ?

রাম দু হাত নেড়ে বলল, একটা লোভে পড়ে; লাভের আশায়। এখানে একজন বড় কাঠের ঠিকাদার আছেন। এ বছর দেরী করে কাজ শুরু করাতে জঙ্গল থেকে কাঠ বের করতে সুবিধে হয়নি। অথচ বর্ষা ভাল করে নামার আগে আগে সব কাঠ বের না করতে পারলে জঙ্গলে কাটা কাঠ পচে যাবে। তাই উনি দিনে দশ টাকা করে রোজ দিচ্ছিলেন। এই খবর জেনেই মা আমাকে মিথ্যে টেলিগ্রাম করে আনাল। বাবা আর আমরা দু ভাই মিলে পনেরো দিন কাজ করলে সাড়ে চারশ টাকা কামাতে পারব। তাতে দুটো মোষ হয়ে যাবে। আর দুটো মোষ হলে বর্ষার পর চাষের জন্যে মোষ ভাড়া দিয়ে দু পয়সা হবে। বাবা-মা আর শত্রুঘ্নর একটু সুরাহা হবে।

তাই কূপ-কাটার কাজের জন্যে এলাম। এ সবই মার চক্রান্ত। আমি কিছুই জানতাম না। বাবাও না।

কূপ কাটছিস তাহলে এখনও? আমি বললাম।

ও বলল, কাটছি। কিন্তু এসব ছোটলোকী কাজ কী আমার পোষায়? দেখো না, হাতের কী দশা হয়েছে। এসব কাজ আমার আসে না আর। এ সব আমার জন্যে নয়। সারা হাতে ফোসকা উঠে, গলে ঘা হয়ে গেছে। আর দুদিনের মাত্র কাজ বাকি আছে। বৃষ্টিও নেমে গেছে। এই কাদায়, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে জ্বরও হয়ে গেছিল। এখানে ত আর মা পিসীমা নেই যে অসুখ হলেই ওষুধ খেলাম, আরামে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলাম। গরম গরম চা খেলাম। জরি-বুটি করেছি। শরীর এখনও দুর্বল।

আমি বললাম, এই নে, মামাবাবু তোকে একশ টাকা পাঠিয়েছেন, এখন তোর শ্রাদ্ধে লাগা একে।

ও এক দৌড়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলো। বলল, এসব টাকার কথা এখানে বোলো না। মা শুনলেই নিয়ে নেবে। এ আমার টাকা। অনেক দিন ধরে একটা ভাল রেডিও কিনব ভাবছি। কোলকাতায় গিয়ে পুরনো রেডিওটা বেচে একটা ভাল রেডিও কিনবো। আমার মা বড় সেয়ানা মেয়েছেলে। এ টাকার কথা জানলেই নিয়ে নেবে।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোর বাবা-মা না খেয়ে থাকে, আর তোর এত বাবুয়ানীর দরকার কি?

ও বলল, মা-বাবার অভ্যেস হয়ে গেছে। তাছাড়া, অন্য ভাইয়েরা একেবারেই দেখে না, আমি ত তাও দেখি। সংসারে যে করে তার ঘাড়েই সব বোঝা চাপে। ওসব ভালোমানুষী প্রথম প্রথম অনেক করেছি। এখন আর নয়।

আমি আবার চুপ করে গেলাম।

তারপর বললাম, তোর বৌ কোথায়? দু বছর আগে যে বিয়ে করতে এলি সেটাও কি মিথ্যা?

রাম বলল, ছিঃ ছিঃ সবই কী মিথ্যা? বিয়ে করেছি। ছেলের বয়স হয়ে গেল চোদ্দ মাস। ছেলেকে ত এইবারই এসে প্রথম দেখলাম। কাল ওরা সব শ্বশুর বাড়ি গেছে। আগামী কালই ফিরে আসবে। শ্বশুর বাড়ি বিশেষ যেতে দিই না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

ও বলল, আমার শ্বশুরটা একটা ছোটলোক।

আমি বললাম, কেন? ছোটলোক কেন?

ধ্যুৎ! আমার বিয়ের সময় বলেছিল আমাকে একটা সাইকেল দেবে আর বৌকে রূপোর পায়জোর। আজ অবধি দিলো না। ও সব চামারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না আমি।

আমি বললাম, তোর শ্বশুর বুঝি খুব বড়লোক?

বড়লোক আবার কি? এই আমার বাবার মতই অবস্থা।

তবে? যা বলেছিলো না দিতে পেরেছে বলে শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবি না? ক্ষমা করে দে!

ক্ষমা করার কি আছে? পণ দেবে বলল, আর সেই পণের জন্যেই বিয়ে করলাম, নইলে আমার বৌ-এর যা ছিরি। যেমন রূপ তেমন গুণ। তাছাড়া বৌ ত একটা গয়না। চার বছরে একবার দুদিনের দেখা হবে হয়ত। তার জন্যে কিসের ঝক্কি ঝামেলা? ওর চেয়ে আমার লক্ষ্মীই ভাল। কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, সিনেমার গান জানত। আমাকে বলেও ছিল বিয়ে করতে—ঐ তোমার মেসো-মশায়ের সঙ্গে লেগে না গেলে ত বিয়েই করে ফেলতাম। তোমরা

বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়েই দিলে, তার আর কি হবে ?

আমি ভাবছিলাম, রাম ওর নিজের বাড়িতে, নিজের পরিবেশে স্বচ্ছন্দে যে সব কথা আমাকে বলছে তা কোলকাতায় কখনোই বলতে পারত না।

একটু পরে রাম বলল, দাদাবাবু, একটু বোসো। তোমার জন্যে চা করে আনি। এখানে ত ওসব খায় না। আমার কোলকাতায় থেকে চায়ের নেশা হয়ে গেছে। তাই মা আমার জন্যে বাড়ি এলেই একটু চায়ের বন্দোবস্ত করে রাখে। যা চা; ভদ্রলোকের খাওয়ার মত নয়। একটু বেশি করে আদা দিয়ে নিয়ে আসছি। তুমি আরাম করো।

রাম চলে যাওয়ার পর ঘরটার চার পাশে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। শহরে দারিদ্র্য দেখেছি আমি। আমার আত্মীয়-স্বজন চেনা জানার মধ্যেই অনেকে আছেন যাঁরা শহরের মাপকাঠিতে বেশ দরিদ্র। কিন্তু দারিদ্র্যের চেহারা যে কি তা এখানে না এলে বুঝি জানতাম না। মাটির ঘর, শনের ছাদ। বাখারীতে গোঁজা একটি গামছা, দা কুড়ুল। মাটির হাঁড়িকুঁড়ি। হাট থেকে কেনা ছোট্ট একটি আয়না। লাল প্লাস্টিকের চিরুনি একটা। নীল-রঙা সিল্কের রিবন। ছেঁড়া চটের মত বিছানা—দুর্গন্ধ তাতে—এক কোণে মাটির উপর বাঁশের চাটাই পেতে রাখা আছে। একটা কাঁথা—শতচ্ছিন্ন। শীতের সঙ্গে লড়ার হাতিয়ার।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, রামের গ্রামে এসে তাকে তার পরিবেশে আবিষ্কার করে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মাবে, মমত্ব গাঢ়তর হবে। কিন্তু এখন দেখছি, না এলেই ভাল করতাম। আসলে রামও একজন বুর্জোয়া। আমার মত, প্রদীপের মত; দীপের মত।

ও কোলকাতায় যেভাবে থাকে, আমাদের বাড়িতে থেকে থেকে ওর যে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে তাতে ও নিজের মা-বাবা-ভাইকে, ওব গ্রামের মানুষদের আর সমজাতীয় বলে মনে করে না। এমন কি তাদের প্রতি একটা অবিশ্বাস্য প্রচ্ছন্ন ঘৃণা ও অনুকম্পা পর্যন্ত গড়ে উঠেছে ওর। ওর গ্রামের আর দশটা লোকের তুলনায় ও অনেক ভালো থাকে, অনেক ভালো খায় এবং ও ওদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে অনবধানে, অবচেতনে। ওর বাবা-মা গ্রামতুতো আত্মীয়দের শ্রেণীভুক্ত আর নেই ও। ওর সঙ্গে ওদের সকলের একটা শ্রেণীগত বিভেদ গড়ে উঠেছে।

রাম ঘরে ঢুকল। বলল, চা নাও দাদাবাবু।

রামের বাবা দশরথ এলো ঘরে। মানুষটা প্রথমে আমাকে যে আনন্দ ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলো রামের খবরদারীতে সে মানুষটা ইতিমধ্যেই অনেক দূরে সরে গেছে দেখলাম। এখন আর ভালোবাসা নয়, দশরথ ভয় এবং সম্ভ্রম মিশ্রিত দৃষ্টিতে আমাকে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। তার ছোটবেলায় যেমন ইংরেজ শাসকদের দেখেছে, দেশীয় রাজ্যের রাজাদের দেখেছে, আর বড় হবার পর দেখেছে যেমন জোতদারদের, শহর থেকে বিদেশী গাড়ি অথবা হেলিকপ্টারে চড়ে বক্তৃতা করতে-আসা ভোট-কুড়োনো নেতাদের। তেমনি করে।

দশরথকে ডেকে কাছে বসালাম। কুপীর আলোটা দশরথের মুখে পড়েছিল। রোদে-পোড়া, জলে-ভেজা, বলিরেখাময় একটি সরল অভাবী মুখ। যার চাওয়া অতি সামান্য এ জীবনে, অথচ সেইটুকুও পাওয়া হয়নি। এই না পাওয়ার সব ব্যর্থতার জন্যে সে দায়ী করেছে নিজেকে এবং ভগবানের কৃপণতাকে। ওকে কেউ বলেনি যে, ভগবান

বলে কোনো দৈব রাজরূপের পুরুষ এসে হাত ধরে তাকে উদ্ধার করবেন না এই পঙ্ক থেকে। তার দুটো হাত, তার হাতের পেশী, তার মস্তিষ্কের শুভ ও সৎ বুদ্ধি এবং দু হাত ভরা সাহসই একমাত্র তাকে অন্য এক আলোর দেশে নিয়ে যেতে পাবত হয়ত এ জীবনেই। কিন্তু তা হয়নি। সেই অজানাকে দশরথ জানেনি। শত্রুঘ্নও জানবে না। তার ছেলেও না। ওদের মধ্যে কেউ কেউ শহরে গিয়ে পাতি, নয় তস্যপাতি বুর্জোয়া হয়ে উঠবে। এক বুর্জোয়ার ঘাড়ের রক্ত চুষবে অন্য বুর্জোয়া। ডুবডুবা, বালি-হাঁস, পাতি-হাঁস। তারপর রাজ হাঁস। হাঁসে হাঁসে ছেয়ে গেছে দেশ। দশরথের মত কাদাখোঁচারা যেমন কাদায় পড়ে ছিলো, পড়ে আছে; তেমনই থাকবে। এই সুন্দর বিরাট আশ্চর্য ঘুমন্ত দেশের গ্রামে গ্রামে।

দশরথের সঙ্গে কি কথা বলব ভেবে পেলাম না। অথচ খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। ভাষাটাও জানি না। কিন্তু মন যখন বাঙ্ময় হয় তখন ভাষাটা খুব বড় একটা প্রতিবন্ধক নয়।

ওকে বললাম, কূপ কাটছ তোমরা ?

ও জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

কত দূরের জঙ্গল ?

ও বলল, দেড় ক্রোশ। সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে রওয়ানা হয়ে যাব।

আমাকে নিয়ে যাবে কাল ?

রামের খুব আপত্তি দেখা গেল। ও বলল, তুমি কী পাগল হলে ? সারাদিন খাওয়া দাওয়া নেই, অত দূরের পথ, বর্ষাকাল, সাপকোপের ভয়; তাছাড়া এই চারপাশের জঙ্গলে নেই এমন জানোয়ার, হাতী থেকে খরগোশ অবধি।

যে-রামকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোলকাতায় ফেরৎ নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলাম এখানে, সেই রামের চরিত্রের অন্য একটা দিক লক্ষ্য করার পরই ওকে আমার কেমন খারাপ লাগতে লাগল। ওর বাবা দশরথের পরিপ্রেক্ষিত ওকে একটা খল, চতুর, শহুরে শিয়াল বলে মনে হচ্ছিল।

দশরথ বলল, তুই ত কাল সীতা আর লবকে আনতে যাবি শ্বশুরবাড়ি। তুই থাকবি না, বাবু একা এখানে কী করবেন? তার চেয়ে জঙ্গল বেড়ানো হবে। আপত্তি করছিস কেন? বাবু ত এসব কখনও দেখেনি।

রাম ওর বাবাকে একটা গালাগালি দিয়ে বলল, বেশি আর বোকো না। তুমি কী জানো? দাদাবাবু কত যত্ন-আরামে থাকে, কেমনভাবে থাকে—তাদের বাড়ি আমাদের রাজার বাড়ির মত—তুমি কেন দাদাবাবুকে নিয়ে টানাটানি করছ? শেষে অসুখে পড়লে কে সামলাবে? সব দোষ হবে আমার।

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছিল। আমি রামকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দশরথের দিকে চেয়ে বললাম, কাল আমি যাব দশরথ। তুমি সময়মত আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিও।

ওদের বাড়িতে কোনো কুয়ো নেই। একটাই কুয়ো সারা গ্রামের মাঝখানে। সেখান থেকে শত্রুঘ্ন আমার জন্যে মাটির ঘড়া করে জল এনে এনে উঠোনের এক কোণে রাখা বড় মাটির জালাতে জল ভরে দিলো।

চান করলাম। তারপর খেতে গেলাম। দশরথ আর রামের মা যে ঘরে থাকে সে ঘরেরই এক কোণায় দশরথের মা কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করেছিল। গরম গরম লাল চালের ভাত, কলাই-এর

ডাল, আর আলু ভাজা। মেঝেতে হলুদ কাঠের পিঁড়ি পেতে বসে পিতলের থালায় খেলাম।

বুঝলাম যে, আমার জন্যে স্পেশ্যাল মেনু হয়েছে আজ। ভাতটা যে কী মিষ্টি তা কী বলব। ভালোবাসার হাতে রাঁধা, অনেক সম্মান ও সম্ভ্রমের সঙ্গে পরিবেশিত সেই অতি সাধারণ খাবার খেতে খেতে আমার চোখ ছলছল করে উঠল।

বললাম, তোমরা কী রোজই রাতে ভাত খাও?

দশরথ বলল, দু-বেলা ভাত জোটেই না। একবেলা খাই। এখানের বেশির ভাগ লোক ভাতের সঙ্গে আফিং-এর গুঁড়ো সেদ্ধ করে খায়। তাতেই নেশা হয়। নেশার জোরে সারাদিন কাজ করে। দেখবে, দিনের বেলায়, এখানের লোকজনের হাত-পাগুলো সরু-সরু—ওদের চোখগুলো হলুদ হলুদ। তিরিশেই ওরা প্রায় সকলে বুড়ো হয়ে যায়। বেশিদিন ওরা বাঁচা মানেই কষ্ট। যে-ক'দিন নেশার ঝোঁকে চলে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম আমি। শোওয়ার সময় রামকে বললাম, এখানে মাছ পাওয়া যায়?

ও বলল, পাওয়া যায়; আমার শ্বশুর-বাড়ির গ্রামের টিকর পাড়ায়।

আমি ওকে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, কাল মাছ কিনে আনিস। তোর মা রাঁধবে। ভারী ভাল হাতের রান্না মায়ের।

রাম বলল, এতগুলো টাকা নষ্ট করবে কেন? এরা এ-সবের মূল্য বুঝবে না।

রেগে বললাম, সে আমি বুঝব। তোকে যা বললাম, তাই-ই করবি।

এখন গ্রামে কোনো শব্দ নেই। যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। আগুন বা বাতি জ্বালাবার সঙ্গতি নেই, তাই সূর্যের সঙ্গে ওদের ঘড়ি বাঁধা। সূর্য ওঠার আগে ওরা ওঠে। সারাদিনের জন্যে তৈরি হয় আর সূর্য ডোবার এক ঘণ্টার মধ্যে কাজকর্ম শেষ করে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে।

কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে দূরে। বৃষ্টি-ভেজা গ্রামীণ প্রকৃতিতে সেই বাঁশীর সুর পিছলে যাচ্ছে। উঠোনে বাঁধা গরু-বাছুরের গায়ের গন্ধ সোঁদা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে। গরুর গলার পিতলের ঘণ্টা বাজছে টুংটাং করে। টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। শনের চালে তার ফিস্‌ফিসানি শোনা যায়। রামের মা বাবাও ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে ওদের ঘরে। দূরের কোনো বাড়ি থেকে নবজাত শিশুর কান্না ভেসে আসছে। একটা ভোট বাড়ল। কোন্ দলের কে জানে? কাঠের গরাদ দেওয়া জানালা দিয়ে বাঁশবন দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারে, বৃষ্টিতে মাখামাখি। জোনাকি জ্বলছে চাপ চাপ, নিঃশব্দে। উড়ছে বসছে ওরা। এক আশ্চর্য সুন্দর কিন্তু বড় দুঃখের এই জীবন-যাত্রার এক রাতের শরিক আমি; মোহাবিষ্ট হয়ে গেছি।

দশরথ আমার গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙাল। রাম পিতলের গ্লাসে করে চা এনে দিল। দশরথের সঙ্গে ঘটি হাতে প্রাতঃকৃত্য সারতে চললাম ওদের উঠোনের বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে, জঙ্গলে। ঝির্‌ঝির্ করে একটা নালা বয়ে গেছে জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে। পুবের আকাশে সবে অন্ধকার সরতে আরম্ভ করেছে। একটা সাদাটে ভাব ফুটেছে সেদিকের কালো আকাশে।

দশরথ বলল, বর্ষাকাল। সাপ আছে, বিছে আছে, জোঁকও আছে; সাবধানে যাবেন।

ত্থ মুঠো মুড়ি খেয়ে দশরথের সঙ্গে আমি রওয়ানা হলাম। বেলা বাড়লে, বাস চললে, বাসে করে রাম যাবে টিকর্ পাড়া। ওর বৌ সীতা আর ছেলে লবকে আনতে। এখানের লোকেরা পায়ে হেঁটেই যায়। ওদের হাঁটার অভ্যেস আছে, তাছাড়া বাসে চড়ার পয়সাও নেই। শহরে থেকে রাম বাবু হয়ে গেছে। হাঁটতে পারে না। তাছাড়া রাম বড়লোক। বাস থাকতেও বাসে না গেলে ওর সম্মানে লাগে।

একটু হেঁটেই আমরা গভীর জঙ্গলের স্থঁড়িপথে এসে পড়লাম। সকাল হয়ে গেছে ততক্ষণে। আমাদের আগে পিছে একজন ত্বজন করে লোক চলেছে। পরনে ঐরকম খাটো গেরুয়া ধুতি। কারো পরনে শুধুই গামছা। কাঁধে টাঙ্গী। একজনকে দেখলাম, ত্বটো মোষ নিয়ে চলেছে আগে আগে।

শুধোলাম, মোষ দিয়ে কী হবে? জঙ্গলের মধ্যে ক্ষেত আছে নাকি?

দশরথ হাসলো। বলল, না। মোষ দিয়ে কাঠ টেনে আনবে জঙ্গল থেকে। তারপর ঠিকাদার নিয়ে যাবে সেই সব কাঠ ট্রাকে করে নানান্ জায়গায়।

জঙ্গলের মধ্যে ট্রাক যাবার পথ আছে বুঝি?

দশরথ বলল, প্রত্যেক বছর ঠিকাদারেরা নিজের নিজের জঙ্গলে রাস্তা বানিয়ে নেয়। পুজোর পর থেকে বর্ষার শুরু অবধি কাজ চলে।

কত যে পাখি ডাকছে চারধার থেকে। কি একটা জানোয়ার তীক্ষ্ণ স্বরে জঙ্গলের বুক চিরে কেঁয়া কেঁয়া করে ডাকছিল, থেকে থেকে।

চমকে উঠে বললাম, ওটা কি?

দশরথ অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে, বলল, ময়ুর। বর্ষাকাল ত! এখন ময়ুররা খুব ডাকাডাকি করে, পেখম ধরে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলতে একটুও ক্লান্তি লাগে না। বর্ষার দিগন্তবিস্তৃত নরম সবুজ বন-পাহাড়ের বুক চিরে চলে-যাওয়া জানোয়ার এবং মানুষের পায়ের দাগে গড়ে ওঠা পথ ধরে অনেকদূর চলে এলাম।

হঠাৎ আমাদের সামনে দিয়ে একদল চিতল হরিণ লাফাতে লাফাতে পথটাকে আড়াআড়ি পার হয়ে গেল। ভাল করে দেখার আগেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের দ্রুতধাবমান শরীরের পরশে ঝোপ-ঝাড় লতা-পাতা থেকে টুপ্-টাপ্ শব্দে বৃষ্টিতে জমা-জল ঝরে পড়তে লাগল নীচে।

দেড়ক্রোশ রাস্তা দেখতে দেখতে শেষ হল। এখানেই ঠিকাদারের ডেরা। জলের সুবিধার জন্যে একটা ছোট পাহাড়ী নদীর পাশে পাশাপাশি দাঁড় করানো ও লতা দিয়ে বাঁধা, মাটি দিয়ে লেপা কাঠের দেওয়াল ও শনের চালের বড় ঘর। মধ্যে বাঁশের মাচা। তার উপরে মুহুরী শোয়। মুহুরীর পরনে গাঢ় নীল রঙের লুঙি, সাদা ধবধবে হাতওয়ালা গেঞ্জী, পায়ে প্লাসটিকের পাম্পশু, হাতে স্টীলের ব্যাণ্ডে বাঁধা হাতঘড়ি। কাঁধে ঝোলানো ট্রানজিস্টর। স্ট্যাটাস্ সিম্বল।

মুহুরীর বয়স বেশি নয়। বাইশ তেইশ হবে। অষ্টম ফেল। অর্থাৎ, ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল। সেই-ই এখানে ঠিকাদারের প্রতিভূ। তার হাঁটা-চলা, কথাবার্তা উদ্ধত এবং কর্তৃত্বময়। কথায় কথায় সকলকে গালাগালি করছে সে! তার অধস্তন আরো দুজন কর্মচারীদের এবং কূপ-কাটতে-আসা সমবেত কুলীদের উপর খবরদারী করছে।

সেই ডেরারই পাশে অনেকগুলো সার সার শনের ঝুপড়ি—তাতে দূরাগত অনেক কুলী রাত কাটায়। তাদের ঝুপড়ির সামনে তিনটে করে পাথবেব উপর বসানো আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া মাটির হাঁড়ি—। কারো ভাত রান্না হয়ে গেছে, কারো হয়নি। কারো কারো খাওয়াও শেষ। তখনো কাঠেব ও ভাতের ধোঁয়া বেরুচ্ছে উনুন ও হাঁড়ি থেকে।

দশরথকে শুধোলাম, এরা কী দিয়ে ভাত খায়?

ও বলল, শুধু ভাতই খায়, কেউ কেউ নুন দিয়েও খায়। কখনও কিছু তরকারী পেলে তাও সেদ্ধ করে। কখনও শিকারী এলে বা মুহুরীরা শিকার করলে মাংস খায়। ন'মাসে ছমাসে একবার। অনেকে আফিং-এর গুঁড়ো সেদ্ধ করে খায় ভাতের সঙ্গে, কাল যেমন বলেছিলাম।

মুহুরী আমাকে বিশেষ খাতির যত্ন করল। লোকটা বিশেষ শ্রেণী-সচেতন। আমার দামী সিগারেটের প্যাকেট, গ্যাস লাইটার, পোশাক-আসাক দেখে আমি যে ওর মালিকদেরই শ্রেণীর সে বিষয়ে ও নিশ্চিন্ত হয়েছিল। আমাকে নারকোলের দড়ি দিয়ে বোনা একটা মোড়া মত জিনিষে বসতে দিল ও। চা খাওয়ালো এবং ডিমভাজা খাবো কিনা জিজ্ঞাসা করল।

একটু পরে ও হঠাৎ আমার কাছে এসে সমারোহ সহকারে একটা সিগারেট চাইল। এবং সিগারেটটা নিয়ে তার টিনের তৈরি পেট্রলের লাইটার দিয়ে কুটুং করে আগুন ধরিয়ে, গাঁজার কল্কের মত করে সিগারেটটা ধরে একটা বিষম টান দিয়ে ওর জ্বলন্ত প্রভুত্বের আগুন সকলকে দেখিয়ে তার নির্বিবাদ মালিকানা সম্বন্ধে গাছ-গাছালির নীচে বসে—দাঁড়িয়ে থাকা কাছে-দূরের মনুষ্যেতর

মানুষগুলোকে নিঃসংশয় করল।

একটি লোক এসে ওকে বলল, আজ কি টাকা পাওয়া যাবে? দশদিন হয়ে গেল, এখনও কেউই পেলাম না বাবু। বৌ ছেলে মেয়ে না খেয়ে রয়েছে।

মুহুরী কিছুক্ষণ লোকটার দিকে তাকাল, তারপর সিগারেটের ছাইটা ওর প্রায় মুখের ওপরই ঝেড়ে ফেলে বলল, এ জঙ্গলে সব গাছই আছে। শুধু টাকার গাছ নেই। টাকা দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার কাজ তোদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া। বাবুর পরশুই আসার কথা ছিল কিন্তু বাবুর বন্ধুরা এসেছেন ভুবনেশ্বর থেকে। তাঁদের নিয়ে লবঙ্গীর জঙ্গলে বাবু শিকারে গেছেন। সব ভারী ভারী বন্ধু। বড় বড় সরকারী অফিসার, ব্যবসাদার। তাঁদের ত তোদের কারণে ফেলে দিতে পারবেন না বাবু।

লোকটি একটু অন্যরকম। সে তেরীয়া হয়ে বলল, তা বাবু না আসতে পারলে কি হল? রোজ ট্রাক আসছে, ইচ্ছে করলে বাবু টাকাটা কি ড্রাইভারের হাতে পাঠাতে পারতেন না?

মুহুরী চটে গেল। বলল, বেশি কথা বলবি কী এক হাত খাবি। বলেই, ডাকলো, কপিলা, এই কপিলা···

কপিলা নামক একটি বুড়ো লোক এগিয়ে এল।

মুহুরী বলল, তুমি ত এদের সর্দার। এদের বুঝিয়ে বলোনি? এরা কেন এসে আমাকে বিরক্ত করে? যা বলার তুমিই বলবে আমাকে এসে। এদের সকলের কথা শোনার আমার সময় নেই।

বুড়ো বলল, ঠিক ঠিক। ঐ ছেলে-ছোকরাদের কথা শোনো কেন?

তারপরেই কপিলা আমার কাছে একটা সিগারেট চাইল।

ওকে সিগারেটটা দিয়ে আমি ধরিয়ে দিলাম।

হঠাৎ আমার তখন দশরথের কথা মনে পড়ল। বললাম, দশরথ তুমি কী সিগারেট খাও?

দশরথ মিষ্টি করে হাসল, বলল, আমি মাঝে মাঝে তামাকু খাই। ঐ সব কোথায় পাবো?

আমি বললাম, খাবে একটা?

দশরথ বলল, না না। এত ভাল জিনিষ নষ্ট করবে কেন আমাকে দিয়ে। আমার ওসবে অভ্যেস নেই। জঙ্গল জায়গা, তোমার কম পড়ে গেলে অসুবিধে হবে।

কটক থেকে এক কার্টন সিগারেট কিনেছিলাম আমি। জানতাম যে, কম পড়বে না। জোর করে দশরথকে দিলাম একটা।

দশরথ আপত্তি সহকারে নিল। তারপর যে ছেলেটি এগিয়ে এসে মুহুরীর সঙ্গে কথা বলেছিল তাকে আধখানা ছিঁড়ে দিল। তারপব আমার লাইটারের প্রত্যাশা না করে ভাত-ফোটানো একটা উনুনের কাছে গিয়ে গাছ থেকে সরু কাঠি ভেঙে আগুনে দিয়ে তা থেকে ধরিয়ে নিল।

মুহুরী কথা বলার সময় মধ্যে মধ্যে দু-একটা ইংবেজী শব্দ বলছিল। ও যে বিদ্বান তা দেখাবার জন্যে। ও বলল, ওদের বেশি লাই দেবেন না স্যার। ছোটলোকদের ছোটলোকের মতই রাখতে হয়। দূরে দূরে। নইলেই ঘাড়ে চড়ে বসে। ট্রাবল্ দেয়।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোমার বাড়ি কোথায় ভাই?

ও বলল, করত্পটা।

তারপর বলল, করত্পটা মানে জানেন? করত্ মানে করাত; স।

আমি বললাম, ও।

তারপর বললাম, আর ওদের বাড়ি ?

কাদের ?

ঐ যে ছেলেটা এসেছিল টাকা চাইতে, কি নাম ওর ?

ওর নাম রামকৃষ্ণ। ওর বাড়িও করত্‌পটা। ও ছোট জাতের লোক। দশরথটার এত বয়সেও বুদ্ধি হলো না। আপনার দেওয়া সিগারেট ও ওকে দিয়ে দিল আর্ধেক।

তারপর বলল, এরা আনএডুকেটেড। এ-বি-সি-ডিও জানে না। এদের সঙ্গে কুকুর বেড়ালের মত ব্যবহার করলে তবে এরা ঠিক থাকে।

ওরা এবারে সকলে কাজে গেল। মোষগুলো আগেই গেছিল। যেখানে ওরা কাঠ কাটছে সে জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূর নয়। কাঠ কাটার শব্দ আসছে। লোকজনের গলার। কাঠ ঠেলে নামানো ও মোষের গাড়িতে বোঝাই করার সময় ওরা গলা মিলিয়ে গান গাইছে। গানগুলি গাইবার ধরন ও ওদের উল্লাস দেখে মনে হল গানগুলো অশ্লীল। অশ্লীলতাও আফিং-এর গুঁড়োর মত ওদের আর একটা ঘুমপাড়ানী নেশা, যে নেশা দৃষ্টিকে, ভাবনাকে অস্বচ্ছ করে, আসল দ্রষ্টব্য থেকে চোখকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে।

কাল, বাসে আসতে আসতে নানা গ্রাম এবং এখানে হেঁটে আসবার সময় গভীর জঙ্গলের মধ্যে আরও যে-কটি এক-মুঠো গ্রাম দেখলাম, তা দেখে এই-ই মনে হয়েছে যে, জনসংখ্যাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। পপুলেশন এক্সপ্লোশন কথাটা কি তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই ভয়াবহতা অজানা থাকে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও দেশের সবচেয়ে প্রধান ও মূল সমস্যাটা

নিয়ে কোনো দলই মাথা ঘামান না। দেশের ভাল করতে গিয়ে ভোটের ক্ষতি করাব মত মূর্খ রাজনীতিক এদেশে আজকে আর নেইই। বরঞ্চ প্রতি বাতে যদি নেতাদেব নিজেদের বিনা চেষ্টাতেই ভারতের ধুলোতে, কাদাতে দারিদ্র্যে তাদের লক্ষ লক্ষ ভোটাব বাড়ে তাতে ত তাদেবই মঙ্গল। এই দশবথকে রামকৃষ্ণকে রামকে, এমন কি নবীন মুহুবীকেও যত সহজে ভোট দেওয়ানো যায় কোনো মনোমত বাক্সে, আমাকে দিয়ে ত তা হবে না। তাই, এই আশ্চর্য পরিহাসের গণতন্ত্রের পঙ্কে যত পদ্ম ফোটে রাজনৈতিক নেতাদেব পদযুগল ততই পদ্মশোভিত হয়।

মুহুরী বলল, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত কবি? মুর্গী আছে। ডিম আছে। কি খাবেন বলুন স্যার?

আমি বললাম, দশরথরা কী খাবে?

ওদের কথা ছাড়ুন। ওরা যা খায়, খাবে; তা কি আপনি খেতে পারবেন? ওরা কি মানুষ না কি?

আমি হেসে বললাম, ওরা মানুষ নয় বুঝি?

মুহুরী বলল, নাঃ। এই জঙ্গলে যেমন নানারকম জানোয়াব আছে। ঝিংক, গন্ধ, পে ওড়া, খুরান্টি, বরা; ওরাও তেমনই। ফুল কুড়িয়ে, মূল খুঁড়ে হাঁচরে পচিয়ে কোনক্রমে বেঁচে থাকে। না কালচার, না এডুকেশান, না কিছু। ওদের আমি মানুষ বলে মনে করি না।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে, ক্ষুদ্রতম পাতিবুর্জোয়াগুলো রাজ বুর্জোয়াদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ জীব। কাল রামকে দেখলাম এবং আজ নবীর মুহুরীকে।

মুহুরী বলল, বলুন বলুন কি খাবেন?

তারপরই বলল, একটু ড্রিঙ্ক করবেন নাকি স্যার ?

আমি অবাক হলাম না। নবীন মুহুরীও, কোলকাতার ক্লাবে পার্টিতে দেখা সুবেশ, সম্ভ্রান্ত অনেকানেক চরিত্রের মত, নিজের শ্রেণীর ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েই অন্য উচ্চতর (?) শ্রেণীতে ঢুকে পড়াব চেষ্টা করছে।

আমি হাসিমুখে বললাম, ড্রিঙ্ক ? এখানে ? কি ড্রিঙ্ক ?

ও বলল, পাওয়া যায় অনেকরকম, কিন্তু এখন পানমৌরীই আছে শুধু। ফোরেন লিকার আমার কাছে নেই। আমার বাবু থাকলে খাওয়াতে পারতাম।

আমি বললাম, পানমৌরী ? সেটা কি জিনিস ?

মৌরী ফুলের থেকে হয়। জিনিষ, ফার্স্ট ক্লাস। আপনি আজ রাতে থেকে যান না স্যার। আমার মালিক যদি না আসেন তাহলে এখানে টিপ-টিজ্ করে দেবো আপনার জন্যে।

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না।

অবাক গলায় বললাম, টিপ-টিজ্ মানে ?

নবীন মুহুরী হাসল। বলল, আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন স্যার ? কোলকাতার সাহেব আপনি আর টিপ-টিজ্ জানেন না ?

তারপর বলল, আমাদের ডেরা থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বিড়িপাতার জঙ্গল আছে। ওখানে ঠিকাদারের কাছে কামীনরাও কাজ করে। যদিও ওদের ক্যাম্প ভেঙ্গে গেছে তবে কুলী-কামীনদের যেতে এখনও দু-একদিন বাকি। তিন-চারটে মেয়ে নিয়ে আসব। আমার ট্রানজিস্টারে ঝিং-চাক্ গান বাজবে আর আমরা পানমৌরী খাবো আর ওরা টিপ-টিজ্ করবে।

আমি চুপ করে থাকলাম।

নবীন মুহুরী বলল, কী হল স্যার? রাগ করলেন?

আমি বললাম, রাগ করব কেন? ভাবছি, তুমি আমাকে এত খাতির যত্ন করছ কেন? তুমি ত আমাকে চেনোই না।

নবীন ওর ঘড়ি-পরা হাতটা হাঁটুর ওপর চাপড়ে বলল, এই জঙ্গলে একা পড়ে থাকি এই জংলী জানোয়ারদের সঙ্গে—একেবারে বোরড্ হয়ে গেলাম স্যার।

আমি বুঝলাম, এই বাক্যটি নিশ্চয়ই তার মালিকের কাছে শোনা। নইলে করত্পটার অষ্টম-ফেল ছাত্রর পক্ষে 'বোরড্ হয়ে গেলাম'-এর মত শহুরে অভিব্যক্তি জানবার কথা নয়।

ছেলেটি বেশ ইন্টারেস্টিং। মালিককে খুব ভাল অনুকরণ করেছে ও। একেবারে প্রোটোটাইপ্। মালিকরা এইরকম চাকরদেরই পছন্দ করে। এদেরই উন্নতি হয়। নবীন মুহুরী কখনও হয়ত এই জংলী ঠিকাদারীর সামান্য অংশের অংশীদার হবে একদিন। এই একই প্রক্রিয়ায় বড় বড় কোম্পানীতে বোর্ডরুমে ঢোকেন এ-বি-সি-ডি শেখা সিগারমুখো, পাইপ-খেকো লোকেরা। প্রক্রিয়াটা একই। শুধু ক্ষেত্র ও পরিবেশ আলাদা।

দুপুরে দশরথের সঙ্গে বসেই খেলাম। একটা বড় তেঁত্‌রা গাছের নীচে কালো চ্যাটানো পাথরের উপর। গাছটার নাম দশরথই বলেছিল। ও গামছার ভিতরে কচি শালপাতার দোনায় মুড়ে গুল্‌গুলো আর বিড়ি-বড়া-এনেছিল। সঙ্গে ছিল নুন, কাঁচাকলা আর পেঁয়াজ।

চারিদিকে ওরা সকলে তখনও কাজ করছিল। বুঝলাম যে, এখানে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি নেই। ওরা ভোরে খেয়ে কাজ শুরু করে আর সূর্যাস্ত অবধি কাজ করে। তারপর ঝুপড়িতে ফিরে আবার

কিছু খায়।

আমার খাতিরেই আজ দশরথকে বুঝি ছুটি দিল মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে। নবীনের অধস্তন কর্মচারী এবং কাঁচের গ্লাসে চা বানিয়ে নবীন ওর লোক দিয়ে সেখানে পাঠিয়েও দিল।

দশরথ প্রায় কিছুই খাচ্ছিল না। বলল, আমি ত কোনোদিন কাজে এসে এ সময় খাই না বাবু, আমার অসুবিধে হবে কাজ করতে।

তারপর বলল, আমাদের এখানে পোড়পিঠা বলে একরকম মিঠাই হয়, রামকে বলব, যখন যাবে আপনার ও বাড়ির সকলের জন্যে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, আচ্ছা।

একটা বিড়ি-বড়া ও গুলগুলো খেয়েই দশরথ নদীতে আঁজলা ভরে জল খেয়ে আবার কাজে গেল।

বেশ লাগছিল জায়গাটা। মেঘলা দুপুরের ছায়াশীতল কাকলি-মুখর জঙ্গল—মাঝে মাঝে শুধু মানুষের গলার আওয়াজ ও দূরের কাঠ কাটার আওয়াজে ছিদ্রিত হচ্ছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে পাথরটার উপরে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। নদীর ওপারে দূর থেকে কি যেন একটা জানোয়ার গম্ভীর বুক-কাঁপানো গম্‌গমে এবং গা ছমছম ডাক ডাকছে থেকে থেকে।

দশরথ দৌড়ে এসে আমাকে বলল, বাঘ বেরিয়েছে বাবু, তুমি এখানে একলা আছ তাই দৌড়ে এলাম। চলো চলো, ডেরায় চলো। ওখানে পোড়ো আছে আর আগুন আছে, ওখানে ভয় নেই।

আমি বললাম, পোড়ো কি ?

ও বলল, পোড়ো মানে মোষ।

আমরা বড় বড় পায়ে ডেরায় ফিরে এলাম। সেখানে দেখি সব লোক জমা হয়েছে। ভাবলাম, বাঘের ভয়ে।

দশরথ বলল, বাঘের ভয়ে ওরা সকলে এখানে জমা হয়নি। ক্ষিদের ভয়ের কাছে বাঘের ভয় কিছু না। তিনদিন ধরে মালিক আসবেন আসবেন করছেন। ওদের সকলের দশদিনের মজুরী বাকি। কারোরই টাকা না পেলে অচল। তাই আজ মালিক না আসা অবধি ওরা অপেক্ষা করবে, তারপর হিসাবপত্র করে টাকা নিয়ে রাতটা, যারা এখানেই থাকে তাদের সঙ্গে কিছু মুখে দিয়ে ঝুপড়িতে শুয়েই কাটিয়ে দেবে। তাহলে কাল আবার কাজ-টাজ সেরে সন্ধেবেলায় যার যার গ্রামে ফিরে যেতে পারবে টাকা নিয়ে।

আমি বললাম, কিন্তু বাঘ বেরিয়েছে যে ?

দশরথ হাসল। বলল, বাবু বনে বাঘ বেরোবে না ত শহরে বেরোবে ? বাঘ বাঘের মত থাকবে। ভেবেছিলাম, আমরা যে যার পথে চলে যাব দিনে দিনে। টাকার জন্যে থেকে তোমাকে ত অসুবিধেয় ফেললাম।

আমি বললাম, অসুবিধের কি ? আমি ত একা নই। তুমিও ত আছো। তাছাড়া আমার এখানে কাজটা কি ?

নবীন বলল, মালিকের এতক্ষণে এসে যাওয়ার কথা। এ জঙ্গলে সন্ধ্যার পর হাতী বেরোয়। এক যদি হাতীতে পথ আটকে থাকে ত আলাদা কথা।

রামকৃষ্ণ বলে ছেলেটি হঠাৎ বলল, এটা অন্যায়। তিনদিন হল হপ্তা পুরেছে, রোজ ট্রাক আসছে, মাল গেদে নিয়ে যাচ্ছে আর

আমাদের টাকাটা বাবু পাঠাতে পারলেন না ড্রাইভারকে দিয়ে ?

হঠাৎ, নবীন মুহুরী চিতার মত এক লাফে ওর দিকে গিয়ে ঠাস্ করে এক চড় মারল ছেলেটিকে।

ছেলেটি, ভেবেছিলাম, হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, হয়ত এক ঝট্কায় ওর টাঙ্গীটা তুলে নেবে, কিন্তু ছেলেটা কিছুই না করে মুখ নামিয়ে নিল।

বলল, আমার ছেলেটার খুব অসুখ। দরকার ছিল···বড়।

এমন সময় সেই বুড়োটা, যে কুলিদের সর্দার, কপিল, সে এগিয়ে এসে বলল, কি হল ? আমি সর্দার এখানে থাকতে গোলমালটা কিসের ?

তারপর বলল, দ্যাখো মুহুরীবাবু, এটা ভালো নয়।

নবীন তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, যা যা, আমাকে ভালো-মন্দ শেখাস না।

নবীনবাবু, আমরা তোমাকেই জানি, বাবুর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ? তুমি টাকাটা এই তিনদিনে আনাবার বন্দোবস্ত করলে না কেন ?

নবীন তার বয়স অনুপাতে অনেক বেশি সাহসী এবং ঠাণ্ডা মাথার লোক। ব্যবসাদাররা এবং তাদের অনুগত কর্মচারীরা সব সময়ই তাই-ই হয়।

অবস্থা বেগতিক দেখে হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ও বলল, বুড়োকেও দেখি ভীমরতিতে ধরল ! বাইরে বাঘ ডাকছে, মেঘও গুড়গুড় করছে, কোথায় একটু চা খাওয়ার কথা বলবে, একটু গান টান হবে, নাঃ। যত্তো সব···

তারপরই নবীন গলা চড়িয়ে ওর একজন অনুচরকে বলল, বড়

হাঁড়িতে করে চায়ের জল বসা। আজ সকলকে চা খাওয়া রে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, আপনার কোনো চিন্তা নেই। যত রাতই হোক, সঙ্গে শিকারী আর টর্চ দিয়ে দশরথের সঙ্গে আমি আপনাকে জঙ্গল পার করিয়ে দেবো। নিশ্চিন্তে থাকুন বাবু।

আমি বললাম, চিন্তা কিসের? তুমি যখন আছ।

ঐ বুড়োটাকে সকলেই এক সঙ্গে কপিলা কপিলা করে ডাকছিল। সব কুলিরাই দেখলাম টাকা না পাওয়ার কারণে বেশ উত্তেজিত।

নবীন চায়ের তদারকীতে ডেরার ভিতরে গেল। এমন সময় পুটুর পুটুর করে বৃষ্টি নামল আবার। পাতায় পাতায়, ঘাসে লতায় টুপুর টাপুর শুরু হল। হঠাৎ হাওয়া ছাড়ল বনে বনে। সেই হাওয়ার দমকে দমকে বৃষ্টির ছাঁট আসতে লাগল ডেরার বাইরের খোলা ঘরে।

আমি অবাক হয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম। অন্ধকারে দেখা যায় না বলেই জানতাম এতদিন, কিন্তু অন্ধকার নিজেও যে দেখার মত এমন একটা বস্তু তা দশরথের সঙ্গে আজ জঙ্গলে না এলে জানতে পেতাম না। শহরে লালিত-পালিত আমি, আমার জীবনে ও স্মৃতিতে এই দিনটি ও রাতটির অভিজ্ঞতার মত খুব বেশি কিছু থাকবে বলে মনে হচ্ছিল না।

এমন সময় বাঘটা আবার ডাকল। ভেজা বন-পাহাড়ে সে ডাক দিকে-দিগন্তরে ছড়িয়ে গেল। দশরথরা খুব একটা গ্রাহ্য করল না। কে যেন বলল, আগুনটা জোর করতে। মোষগুলো ডেরার বাইরে এক জায়গায় জড়ো হয়ে ছিল। তারা বাঘের ডাক শোনামাত্র গোল হয়ে বিভিন্ন দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে।

বাঘটা ডাকতে ডাকতে দূরে চলে গেল। তার গম্ভীর ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে বন প্রান্তরে উড়ে গেল। বৃষ্টিটাও ধরে গেল, যেমন

হঠাৎ এসেছিল···তেমনই।

কুলীরা সব বাইরে চলে গেল। কেউ ঝুপড়ির সামনে, কেউ ফেলে রাখা কাঠের গুঁড়িতে, কেউ পাথরে ফাঁকা জায়গা দেখে সবাই বসে পড়ল। ঝুপড়ির সামনে আগুনগুলো জোর করে নতুন করে ভাতের হাঁড়ি চাপাল ওরা। দশরথও ওদের সঙ্গে ডেরার বাইরে গেল।

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। এমন সময় নবীন এল। সঙ্গের লোকটিকে বলল, যা, চায়ের হাঁড়ি নিয়ে গিয়ে সকলকে চা দে।

আমাকে গেলাসে করে চা এনে দিল অন্য একটি ছেলে।

নবীনকে একটা সিগারেট দিলাম। তারপর বললাম, তোমার বাবু যদি আজ না আসেন তাহলে কি হবে? এরা কি ক্ষেপে উঠবে?

নবীন হাসল। বলল, এরা ক্ষেপে-টেপে ওঠে না। তবে মালিকেরও কী আক্কেল বলুন ত? লোকগুলো টাকার জন্যেই ত এই বর্ষায় এমন করে মেহনত করছে? গরীব লোক, তাও দশ দিন হল, টাকার নাম নেই। অথচ কালই শেষ কাজের দিন। কি যে হবে জানি না।

আমি বললাম, ওদের মধ্যে অনেকেরই কিন্তু মুড ভালো না। যদি ক্ষেপে ওঠে?

নবীনকে সামান্য চিন্তান্বিত দেখাল। তারপরই সে বলল, কিছুই হবে না। বলেই ডাকল, কপিলা, এই কপিলা।

বৃষ্টি ভেজা হাওয়ায় গা-শিরশির করছিল। নানারকম লতা-পাতা জংলী ফুল গাছ-গাছালির ও মাটির মিশ্র গন্ধ ভেসে আসছিল হাওয়ায়। তার সঙ্গে মোষগুলোর গায়ের গন্ধও। তার মধ্যে মিশে-ছিল কাঠের আগুনের গন্ধ এবং ফুটন্ত ভাতের গন্ধ। শেষ গন্ধটা বড় মিষ্টি। ভাতের গন্ধ যে এত মিষ্টি হয় তা এর আগে কখনও বুঝিনি। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। জীবনে ক্ষিদে কাকে বলে তেমন করে

জানিনি কখনও। ক্ষিদের পটভূমিতে ফোটাভাতের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হলাম আমি।

কপিলা বুড়ো ঘরে ঢুকল। ঢুকেই বলল, এই মহুরীবাবু, আজ কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত হবেই।

নবীন ওর কথাকে পাত্তা না দিয়েই বলল, কি হবে না হবে সে আমি বুঝব, তুই কি খাবি?

—কি খাব?

বুড়ো অবাক চোখে তাকাল।

নবীন ইসারায় হাত দিয়ে দেখাল। তারপর বলল, পানমৌরি?

কপিলার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, দে দে। কোথায়? বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়ে গেছি। সোঁদা হাওয়ার গা সিরসিরানি কি শুধু চায়ে যায়?

তারপরই বলল, সকলকে ডাকি, কি বল?

নবীন তক্ষুনি বলল, সকলের কথা জানি না। আমি শুধু তোকে খাওয়াতে পারি। একা। সকলে আর তুই কি এক হলি? তুই রাজা আর ওরা তোর প্রজা।

কপিলা এক সেকেণ্ড যেন কি ভাবল। তারপর বলল, তা আন।

নবীন ভিতর থেকে এনে বোতল দিল কপিলাকে। কপিলা লোভীর মত বোতলটা দু হাতে আঁকড়ে প্রথমেই কিছুটা ঢকঢক করে খেয়ে নিল, তারপর আস্তে আস্তে খেতে লাগল।

নবীন আমাকে বলল, স্যার আপনার ড্রিঙ্কস?

আমি বললাম, আমি বেশ আছি।

রাত যখন প্রায় নটা বাজতে চললো তখনো নবীন মুহুরীর মালিকের টিকি দেখা গেলো না। আমার তখন দারুণ ক্ষিদে পেয়ে

গেছে। বাইরের লোকগুলো সোরগোল শুরু করছে। ওদের মধ্যে আমি আর দশরথ এবং শত্রুঘ্ন ছাড়া কেউই ফিরে যাবে না। ওরা বারংবার কথার খেলাপ হওয়াতে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ কে যেন বাইরে থেকে ডাকল, কপিলা, এই সর্দার।

কপিলা বাইরে গিয়ে একবার দাঁড়াল। ওরা একসঙ্গে কি সব বলল ওকে। ও বলল, ঠিক ঠিক, তোমরা ঠিকই বলেছো।

ভিতর থেকে নবীন ডাকল, কপিলা।

লোকগুলো বলল, তুমি যা বলবে আমরা তাই-ই করব সর্দার।

কপিলা বলল, আমি জানি।

কে একজন ছোকরা চেঁচিয়ে বলল, আজ আমরা ছাড়ছি না মুহুরীবাবু। যা হবার তা হবে। কাল বিকেলেই আমরা সব চলে যাব। টাকার জন্যে এই বর্ষায় আর থাকব না জঙ্গলে পড়ে।

নবীন আবার ডাকল, কপিলা।

কপিলা ভিতরে ঢুকতেই কপিলার সঙ্গে সঙ্গে দশরথ এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল নবীনের সামনে, বলল, তুমি শিকারী শিবুকে সঙ্গে দিলেও আমি এই বাবুকে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এতখানি পথ নিয়ে যেতে পারবো না। আজ রাতের মত বাবুর থাকার ব্যবস্থা করে দিও মুহুরীবাবু আর খাওয়া-দাওয়ারও।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, বড় পাপ হল দাদাবাবু। আসলে তুমি এসেছো সেই জন্যেই আমার টাকাটার বড় দরকার ছিলো। তোমাকে একটু খাতির যত্ন করতাম তা দিয়ে। কাল বিকেলে পেলে দেরিও হয়ে যাবে অনেক। তুমি ত কালই চলে যাবে বলছ। তাই আশায় আশায় ছিলাম যে, সন্ধ্যের মুখে মুখে টাকাটা নিয়ে চলে যাবো। এখন এই জঙ্গলে তোমাকে নিয়ে যাবার সাহস

হয় না আমার। এ জঙ্গল বড় খারাপ। জানোয়াররা ত আছেই, তাছাড়াও দেবতা ও ওনারাও আছেন।

তারপর আবার বলল, কি মুহুরীবাবু?

নবীন, তার জ্যাঠার বয়সী দশরথকে, তার দিকে না তাকিয়েই বলল, ভাগ্ ত ছোঁড়া! বাবুর দায়িত্ব আমার। তুই এখন পালা ত এখান থেকে।

দশরথ থতমত খেয়ে চলে গেল।

নবীন কপিলাকে কাছে ডেকে বলল, কি? আজকাল বুঝি পানমৌরি ভালো লাগে না তোমার? খাচ্ছোই না যে একেবারে?

কপিলার চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছিল। জিভও জড়ানো। বলল, ভালো লাগে না? কে বলল?

নবীন আরও একটা বোতল এনে দিল কপিলার সামনে, বলল, খা খা বুড়ো, তাড়াতাড়ি খা। কখন বাবু এসে পড়বে আর খাওয়া হবে না তোর। বলেই, বুনো হাওয়ায় কান পেতে কাল্পনিক জীপের শব্দ শুনতে লাগল নবীন।

কপিলা চক্ চক্ করে কুকুরের মত খেতে লাগল।

কপিলা হঠাৎ বলল, আর আছে?

নবীন বলল, আছে এবং দেবোও তোকে। তবে বদলে তোকে আমার একটা কাজ করতে হবে। আরেকটা খেয়েই তোর ঐ লোকগুলো একজোট হয়ে ফোঁস ফোঁস করছে যে, তা তোর গিয়ে বন্ধ করতে হবে। রামকৃষ্ণ বলছিল, টাকা না পেলে কাল ট্রাকের চাকার হাওয়া সব খুলে দেবে। বাবুর ড্রাইভার রামচরিত সিংকে ফেরৎ যেতে দেবে না কটকে। এসব কি কথা?

কপিলা একটা হেঁচকি তুলে বলল, তাই-ই বলেছে? এত সাহস?'

আমি থাকতে? আমি না ওদের সর্দার। আমি, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

নবীন বলল, এখুনি না। একটু পরে। এইটা খেয়ে যা।

কপিলা হাসল, বলল, তুই বড় ভাল। তারপর বলল, আমার টাকাটা আমাকে দিয়ে দে, নইলে আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে।

নবীন বলল, তোর কত টাকা হয়েছে?

আমার মোটে তিনদিনের বাকি। ওরা ত দশদিনের পায়নি।

নবীন বলল, একটু দাঁড়া। একটু দাঁড়া বলেই ঘরের ভিতরে গিয়ে টাকা নিয়ে এল। কপিলাকে বলল, এই নে তোর তিনদিনের পনেরো করে পঁয়তাল্লিশ আর আরও দশ। তোর কমিশান।

তারপর বলল, আমার কাজটা?

একদ্দম···। কপিলা বলল।

নবীন আমার দিকে ফিরে বলল, দেখুন স্যার, দশরথের টাকাটাও আমি দিয়ে দেব। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ও। দশরথের ব্যাপার আলাদা। কিন্তু কুড়িজনকে দশ টাকা করে রোজ দশ দিনের করে দেবার টাকা ত আমার কাছে নেই। আমার মালিক না এলে আমি কি করব?

কপিলার নেশা পুরো হয়ে গেছিল। বলল, তোর কিছু করতে হবে না, যা করার আমি ত করবই।

নবীন সময় বুঝে কপিলাকে এক ঠেলা দিয়ে ঘর থেকে বাইরে বের করে দিলো। তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। ওরা তখনও খায়নি—প্রত্যেকে ভীষণ উত্তেজিত অথচ কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

কপিলার পেছন পেছন আমিও বেরিয়ে এলাম ও কি করে

দেখার জন্যে।

নবীন ডেরার ভিতরে মাচায় বসে রইল।

একটা বড় পাথরের উপর দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আবার ঠিকভাবে দাঁড়াল কপিলা। উঁচু জায়গায় না-দাঁড়ালে নেতারা বক্তৃতা করতে পারে না। ওর হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি। স্ট্যাটাস্ সীম্বল্। সেই কঞ্চিটা শূন্যে নেড়ে নেড়ে ও বলতে লাগল, তোরা এত উতলা কেন? বাড়িতে আমার বৌ বাচ্চারাও কী খেয়েছে গত দশ দিন?

তারপর একটু চুপ করে থেকে একটা হেঁচ্‌কি তুলে বলল, আমার নিজের কি কোনো বুঝ আছে? আছে আমার বুঝ এই-যে, আমি তোদের সর্দার। আমার নিজের চেয়ে তোদের ভালটা দেখি আগে। তোরা না খেলে আমারও খাওয়া হয় না।

খালি গায়ে, বৃষ্টি-ভেজা কুঁকড়ে-থাকা লোকগুলো এক সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল। বলল, আমরা কি বলেছি তোমাকে না খেয়ে থাকতে?

কপিলা বলল, তাই-ই ত বলছিস। তোরা যেমন হৈ-হল্লা লাগিয়েছিস তাতে ত তাই-ই মনে হচ্ছে। যদি টাকা কালও না পাস তাহলেই বা কি? আমি ত মরে যাইনি। তোদের টাকার জামিন আমি রইলাম। কাল কাজ শেষ হবার পরও যদি টাকা না পাস ত আমি তোদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে যার যার টাকা তাকে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। এই কথা দিলাম আমি। একটু ধার-ধোর করে চালিয়ে নে।

কে যেন বলল, আমাদের ধার দেবে কে? গরীবকে কেউ ধার দেয় না। যার টাকা আছে তাকেই দেয়। ধার দিলে ত কথা ছিলো না।

আবার কথা! কপিলা চেঁচিয়ে উঠল কঞ্চি নাড়িয়ে। নেতার উপর কথা!

তারপর বলল, আর কোনো কথা নয়। যা বলার আমি বলে দিয়েছি। শেষ কথা। আমি যা করি, বা বলি, সব তোদের ভালোর জন্যে। তোদের জন্যেই আমার সব গেল। আর কেউ মুহুরীর কাছে গিয়ে ওকে বিরক্ত করবি না। যার যার মতন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। এই আমার আজ্ঞা।

কপিলার কথা শেষ হতে না হতে দেখি জঙ্গলের মধ্যে দুটো লাল আলো কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে। ও কি? বাঘের চোখ? বাঘের চোখ কি জঙ্গলে রাতের বেলায় এরকম দেখায়? শহুরে-আমি এ বিষয়ে পড়েছি শুধু, অভিজ্ঞতা বলতে কিছুমাত্র নেই।

হঠাৎ কারা যেন কথা বলে উঠল। রাম। রামের গলা। লণ্ঠন হাতে দুটো লোক আর রাম এসে ডেরার সামনে গাছতলায় দাঁড়াল।

রাম ডাকল, বাপ্প এ বাপ্প।

দশরথ দৌড়ে এলো। দশরথ সামনে আসতেই রাম যাচ্ছেতাই করে দশরথকে গালাগালি করল। বলল, তুমি বেজন্মা বুড়ো, মরলে মরো; আমার বাবুকে তুমি কোন আক্কেলে এই জঙ্গলে নিয়ে এলে? এলেই যদি, সময় মত বাড়ি ফিরলে না কেন? কতবার মানা করলাম।

দশরথ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

নবীন মুহুরী বাইরে এসে বলল, তোমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে?

বন্দুক কোথায় পাব? টাঙ্গী নিয়ে এলাম। পথে ভালুকে তাড়া করেছিল। গ্রামের লোক দুটি বলল, রামের বাবুর কোনো ক্ষতি হলে

রাম কোলকাতায় ফিরে মুখ দেখাতে পারবে না, পুলিশ ধরবে ওকে। এই বুড়োটা কিছু বোঝে না।

দশরথ বলল, টাকা না নিয়ে গেলে দাদাবাবুকে আদর যত্ন করতাম কিভাবে? কাল ত শুধু কলাই-এর ডাল আর ভাত খাওয়ালাম। তাতে তোর লজ্জা করল না?

সে আমি বুঝতাম। রাম ঝাঁঝের সঙ্গে বলল। বাবু আমার। তোমার নয়।

আমি বললাম, রাম, অনেক হয়েছে, এবারে চুপ কর। বাবার সঙ্গে এভাবে কথা বলে?

রাম বলল, ছাড়ো ত! এ যেন তোমাদের বাবা। এ ছোটলোক গেঁইয়া বাপ—কিসে কি হয় তা বোঝে না। টাইম জ্ঞান নেই।

নবীনকে বললাম, ওরা যখন তিনজনে এলো তখন আমরা তিনজনে মিলে ছজন হবো। চলে যাই আমরা।

নবীন বলল, মশাল জ্বালিয়ে যাবেন স্যার। হাতীগুলো বড় পাজী এখানের।

তারপর নবীন ডাকল আমাদের ডেরার ভিতরে।

দশরথ আর শত্রুঘ্নর টাকা মিটিয়ে দিল ও।

কপিলা এক কোণে বসে আরেকটা বোতল নিয়ে খাচ্ছিল। আত্মত্যাগী, দেশহিতৈষী, জনগণের নেতা কপিলা। ওর মুখে লণ্ঠনের আলো পড়েছিল।

হঠাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল যে, ওর সঙ্গে সরিৎ-মেসো এবং প্রদীপের বাবার মুখের আশ্চর্য মিল আছে।

রওয়ানা হবার আগে রাম বলল, একটু জল খাব। যে ছেলেটা আমাকে দুপুরে চা দিয়েছিলো পাথরের উপর, ছেঁড়াকাপড় পরা,

হাড় জিরজিরে, পেটফুলো, তাকে জল আনতে বলল নবীন রামের জন্যে।

রাম শহরে থাকে, তার জামার কাপড়ের ছিট ও ছাঁট, তার চুলের কায়দা, হাতের হাতঘড়ি দেখে নবীন মুহূর্তের মধ্যে তাকে তার নিজের শ্রেণীর বলে চিনতে ভুল করেনি।

নবীন বলল, একটু চা হবে নাকি ?

রাম বলল, না না, আমার মা-বৌ হাঁ করে বসে আছে। এতক্ষণে বাবু বাঘের পেটে গেছে কি হাতীর পায়ের তলায় সেই ভেবে অবস্থা কাহিল, আর চা খেয়ে কাজ নেই।

ছেলেটা জল নিয়ে এল ঘটি করে, সঙ্গে গ্লাস।

রাম বলল, তোর জাত কি ?

ছেলেটা কি যেন বলল, ওদের ভাষায়, বুঝলাম না।

রাম এক লাফে সরে গিয়ে বলল, ধ্যাৎ, তুই ছোট জাত, তোর হাতে জল খাবো না।

আমার বড় রাগ হল। আমাদের বাড়িতে ও এতদিন আছে, দিদাইয়া বুধাই সকলেই আমাদের কাছে সমান, জাতের কথা মানলে রামও এমন কিছু শ্রেষ্ঠী নয়, কিন্তু ওর অন্য মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার !

ছেলেটার হাত থেকে ঘটিটা নিয়ে আমি রামকে বললাম, আমার হাতে খাবি ত ? এই নে, খাঃ। বলে জল ঢালতে গেলাম।

রাম আবার বলল, ছিঃ ছিঃ। পাপ হবে। একি কথা !

তারপর নবীনকে বলল, একটু জল ঢেলে দাও ত ভাই।

যে ছেলেটা জল নিয়ে এসেছিল, সে রামের চেয়ে জাতে নীচু, আর আমি রামের মতে জাতে ওর চেয়ে উঁচু, কারণ আমি মালিকের

জাত তাই রামের জল খাওয়াই হত না যদি নবীন না থাকত।

ফেরার সময় মশাল জ্বালিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে আমরা এগোচ্ছিলাম। দিনের বেলা যে জঙ্গল-পাহাড়কে একরকম দেখেছিলাম, রাতের বেলায় মশাল আর লণ্ঠনের আলোতে সেই জঙ্গল-পাহাড়কেই একেবারে অন্যরকম, অপার্থিব, মোহময় বলে মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ পথের পাশে ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজ করে কি যেন একটা ছুটে গেল।

আমি বললাম, কি? কি ওটা?

দশরথ ঠাণ্ডা গলায় বলল, ও কিছু না, ঝিংক।

ঝিংক কি? রামকে শুধোলাম আমি।

রাম বলল, ঐ যে হয় না? কাঁটাওয়ালা জানোয়ার, শুয়োরের মত কিন্তু শুয়োর নয়।

আমি বললাম, শজারু?

হ্যাঁ হ্যাঁ, রাম বলল।

শাপগ্রস্তা অহল্যার মত প্রস্তরীভূত, ভাগ্য-বিশ্বাসী একদল সৎ, সরল কিন্তু বিবস্ত্র, বুভুক্ষু নীরব নিঃশব্দ-পদসঞ্চার মানুষের পিছন পিছন আমি মশালের আলোয় আলোকিত বনের সুঁড়ি পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম অনেক কথা ভাবতে ভাবতে।

ভাবছিলাম, এই আমার দেশবাসী! এই আমার দেশ: সুন্দর মহৎ কিন্তু এক প্রাগৈতিহাসিক শ্লথ অজগরের মত নিশ্চল, হতভাগ্য এই ভারতবর্ষ!

রাজা দশরথ আগে আগে চলেছিল। ন্যুব্জ হয়ে। পিছনে তার তালেবর শহরের আলোকপ্রাপ্ত ছেলে। অন্য ছেলে শিক্ষিত হওয়ায়

তাকে ত্যাগ করেছে। আরেকজন সচ্ছল হওয়ায়। এ দশরথ সে দশরথ নয়। এই রামও সেই রাম নয়। এ এক অন্য রামায়ণের রাজ্যে এসেছি আমি।

৭

মামীমা বললেন, খোকা তোর ফোন।

কে? মামীমা?

কে হতে পারে?

আমি বললাম, রাই?

মামীমা হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ।

আমি দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলাম। রাই ওর মা-বাবার সঙ্গে ভুবনেশ্বর পুরী আরও নানা জায়গায় গেছিল। নিশ্চয়ই ফিরেছে।

রাই রুমির বন্ধু। রুমির সঙ্গে এক স্কুলে পড়ত। তারপর রুমি দিল্লী চলে যায় আর ও এখানে। রুমি যখনই আসত রাই তখনই ঘনিষ্ঠ হতো। তারপর রুমি দূরে চলে গেল ধীরে ধীরে, রাই আর আমি কাছাকাছি এলাম।

রাই বলল, কী খবর? কেমন আছো?

আমি বললাম, তুমি কেমন বেড়ালে বলো?

ও বলল, আমার চিঠি পাওনি?

পেয়েছিলাম।

উত্তর দিলে না যে বড়। ঠিকানা দিয়ে এত করে লিখলাম উত্তর দিতে।

কী লিখব আবার। এসেই ত গেছো তুমি।

তুমি ভীষণ আনরোমান্টিক।

আমি বললাম, ভাল চিঠি না লিখতে পারলে চিঠি লেখার কোনো মানে হয় না। মার কাছে শুনেছি অনেকবার, বাবার এক বন্ধু, উনিও আর্মির অফিসার ছিলেন, মাকে চিঠি লিখতেন:

রাণী তোমরা কেমন আছো?

আমার খবর:

১। এখানে গরম

২। ডানদিকের নীচের পাটির শেষ দাঁতে ব্যথা

৩। বইটা পড়া শেষ হয়নি

৪। রণেনকে রাগ না-করতে বোলো।

ওভার।

—সায়ন।

তারপর বললাম, তুমি কী এরকম চিঠি পেলে খুশী হতে?

রিসিভারে রাই-এর চাপা হাসি ভেসে এল। বলল, তোমার মনেও থাকে সব পুরোনো কথা! নয়ত বানিয়ে বানিয়ে বলছ। এতো ছেলেমানুষ না তুমি।

আমি বললাম, মেয়েদের কাছে ভালোবাসার জন মাত্রই ছেলে-মানুষ।

আহা রে; কত শিওর নিজের সম্বন্ধে। বেশি ওভার-কনফিডেনট হয়ো না, এখনও ব্যাক-আউট করে যেতে পারি।

গেলে পস্তাবে। আমি বললাম।

এজ ইফ তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার? রাই বলল।

থাকবে না কেন? তবে আমার মত কেউই নেই। আমি যে

আমিই।

ঈসস, কী প্রাউড!

আমি বললাম, গুণীরা একটু প্রাউড হয়; কী করা যাবে?

রাই হেসে ফেলল, বলল, গুণ ত রাখার জায়গা নেই। আলমারী কিনতে হবে রাখতে।

আমি বললাম, বিয়ের সময় তোমার বাবা কী একটা আলমারী পর্যন্ত দেবেন না যাতে আমার গুণগুলো তুমি যত্ন করে গুছিয়ে রাখতে পারো?

ইয়ার্কি মেরো না। আমার বাবার বয়েই গেছে। আমাকে তুমি কিসে রাখবে, কেমন করে রাখবে, তাই-ই ঠিক করো আগে, তারপর তোমার গুণ রাখার কথা হবে।

সে সব ঠিক করা আছে, মনে মনে। ভিজুয়ালাইজারের মত আমি মনে মনে সব ছকে রেখেছি। কোথায় শোবে, কীরকম হবে তোমার নাইটির রঙ, কোথায় কোন বারান্দায় বসে আমার দিকে বুশ-আইল্যাণ্ডের কোনো কেলে-মেয়ের মত প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে, তুমি সকালের প্রথম কাপ চা—খাবে সব···। আরো অনেক কিছুই ভেবেছি, যেমন···

থামো তুমি। শোনো, কাজের কথা আছে। এবারে পুজোয় দাদা-বৌদি আমাদের যেতে লিখেছে ডুমিয়াতে।

কেন? তোমার দাদার বাড়িতে সেই সময় চাকর-ঝি থাকবে না বুঝি?

তুমি কোনো সীরিয়াস ব্যাপার সীরিয়াসলি নিতে জানো না।

ভাগ্যিস জানি না। জানলে যে আমার কী হতো তাই ভাবি মাঝে মাঝে।

না, না। ইয়ার্কি নয়। শোনো, দাদাকে লিখতে হবে…

কেন? আগে থেকে এত ফিরিস্তির কি দরকার? আমি কি কোসিগীন, না তুমি মার্গারেট থ্যাচার?

ছাখো, সব সময় এরকম করলে ভালো লাগে না। সামনে ক্যালেণ্ডার আছে? কবে থেকে ছুটি নিতে পারবে একটু দেখে বলো।

না থাকলেই ত ভালো। তোমার সুন্দরী বৌদি ত থাকবে। দাদা কবে থেকে কবে থাকবে না জানাও, আমি একাই চলে যাবো।

আমি ফোন রেখে দিচ্ছি। রাই এবার সত্যিই রেগে বলল।

রাগ কোরো না। ধরো, ক্যালেণ্ডার দেখি।

ও বলল, ধরে আছি। তাড়াতাড়ি ছাখো।

এবার পুজো কত তারিখ থেকে আরম্ভ?

আঃ, তার কী আমিই জানি? সেপ্টেম্বরের শেষে হবে। ছাখো না, তিনটে কি চারটে লাল এক সঙ্গে সেপ্টেম্বরে, তার মানেই পুজো।

ক্যালেণ্ডার দেখে বললাম, মহালয়ার দিন থেকে লক্ষ্মীপুজো অবধি। অতদিন তোমার দাদা খাওয়াতে রাজী থাকবে ত?

আমার দাদা তোমার মত নয়। তাহলে টুকে নিচ্ছি তারিখ। আজই লিখে দিচ্ছি কিন্তু। টিকিট কি তুমি কাটবে? না আমি বাবাকে বলব?

এয়ার-কণ্ডিশানড ক্লাসে একটা ক্যুপে নিতে বোলো। ট্রেন ছাড়লেই তোমাকে…

এত অসভ্য!

আমি বললাম, আহা! যেন কত খারাপই লাগবে?

তুমি, তুমি সত্যিই একটা আটারলি গ্রস, আনসিভিলাইজড্…

আমি সেণ্টেন্সটা কমপ্লিট করলাম—প্রিন্স চার্মিং। তাই না?

তারপরই বললাম, শোনো, তোমার বাবাকে বোলো যে তুমি যখন হানিমুনে যাবে, তখন যেন অন্ততঃ এ-সির ক্যুপের টিকিটই কেটে দেন। এখন আমিই কাটছি। টু-টায়ার।

টু-টায়ার! সেটা কি?

আমি বললাম, তুমি আমার নীচে শুতে চাও, না উপরে?

তার মানে?

মানে, কোন আসন?

কি, বলছ কি? বুঝতে পারছি না।

তুমি ত কোনারক বেরিয়ে এলে।

আমি ফোন কিন্তু সত্যিই ছেড়ে দিচ্ছি। রাই বলল।

ছেড়ে দিলে তুমিই ঠকবে। শেষকালে জড়াজড়ি হয়ে যাবে। টিকিট কাটার আগে বলো।

আমি কখনও টু-টায়ারে চড়িনি।

আমি চড়তাম না কখনও, আমার বাবা রেলের সেলুন পেলে। কিন্তু আমার ত নিজের পয়সায় যাতায়াত করতে হয়—। আমি টু-টায়ারই কাটব। জনারণ্যে কি করে প্রেম করতে হয় তা তোমাকে শেখাবো—তুমি এমন বড়লোকের নেকু-নেকু, পিয়ানো-বাজানো ইনসিপিড্ মেয়ে হয়ে থাকতে পারো না চিরদিন। বিদ্যাবুদ্ধিতে আমার তোমার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট লক্ষ লক্ষ মানুষ থ্রি-টায়ার টু-টায়ারেই যাচ্ছেন। তাতেই যেতে হবে। ওসব চালিয়াতি করলে আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। যেতে হবে না তোমায়।

দ্যাখো! থ্রেট কোরো না। রাই বলল।

তাহলে যেও না।

রাই একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি কী সত্যিই স্লিপারে যাবে?

সত্যিই যাবো। কারণ এখন আমার যা যোগ্যতা, যা মাইনে তাতে তার চেয়ে বেশি এ্যাফোর্ড করতে পারি না। যৌবনে কষ্ট করলে তবে না বার্ধক্যে আরাম। তাছাড়া তোমার ত আবার সোফিয়া লোরেনের মত ঘর-ভর্তি ছেলেমেয়ে পছন্দ। তাদের জন্যে প্রভিশান করতে হবে না? এ-সিতেও চড়ব, এক গাদা বাচ্চার মাও হবো—অত কী করে হবে?

রাই বলল, উঃ। ইনকরিজিবল্।

বলেই, ফোন ছেড়ে দিলো।

আমি মনে মনে হাসছিলাম। আসলে আমার মুড খুব ভালো ছিল। তিনমাস নতুন অফিসে জয়েন করেই জানতে পারলাম ভবিষ্যতের কথা। কাল এম-ডি ডেকেছিলেন। কভেনান্টেড গ্রেড পাবই আমি। কোথাকার ফ্ল্যাট পছন্দ উনি জিজ্ঞেস করলেন। আপাততঃ মে ফেয়ারে কোম্পানীর একটা ফ্ল্যাট আছে। দু হাজার স্কোয়ার ফিটের। আলিপুরেও একটা। একতলায়। ও ফ্ল্যাটটা ছোট কিন্তু সঙ্গে এক চিলতে লন আছে। আর মে ফেয়ার রোডের ফ্ল্যাটটা মাল্‌টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ। গাড়িও পাবো, উইথ শোফার। মেডিক্যাল বেনিফিটস্। বছরে একবার ছুটি এক মাসের। এয়ার-কণ্ডিশনড ক্লাসে অথবা প্লেনে ট্রাভল করার খরচ। ফ্রি-লাঞ্চ অফিসে।

এমনিতেই ত ফাইফডেজ উইক আমাদের। এক সঙ্গে দুদিন ছুটি—অনেক কিছু করা যায়। দুজন চাকরের মায়নাও পাবো কোম্পানী থেকে। প্লাস আমার মাইনে হবে তখন সাড়ে তিন

হাজার মত। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও ট্যাকস কেটে টেক-হোম পে অবশ্য হবে মাত্র দু হাজার। তবে এই গ্রেডে উঠে গেলে সপ্তাহে চারদিন অন্ততঃ ডিনারের নেমন্তন্ন থাকে। মানি বিগেটস্ মানি। এ্যারিথ-মেটিক্যাল প্রগ্রেশানে স্ট্যাটাস বাড়লে জিওমেট্রিকাল প্রগ্রেশানে খরচ কমে। দুটো ক্লাবের মেম্বারশিপ ফ্রি। ভাবছি, স্যাটারডে ক্লাব আর বেঙ্গল ক্লাবের মেম্বার হবো। যদিও আমি একেবারেই ক্লাব মাইণ্ডেড নই। তবুও…ইটস অল ইন দ্য গেম।

এম-ডি বললেন, তিন চার মাসের মধ্যেই কনট্রাকট সই করব তোমার সঙ্গে আমরা। তার আগে কোম্পানীর জন্যে একটা স্পেশ্যাল কাজ তোমাকে করে দিতে হবে। তুমি ছাড়া আর কারো দ্বারা সে কাজটা হবে না।

গর্বে আমার বুক ফুলে গেছিল। বলেছিলাম, নিশ্চয়ই করে দেবো স্যার।

রাই-এর মা বাবা আমার পুরোনো চাকরীর তৎকালীন অকৌলিন্য সত্ত্বেও আমার প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন। রাই-এর পাণিগ্রহণের কথাটা আনুষ্ঠানিক ভাবে বলিনি যদিও তবু আমাদের বাড়িতে এবং ওদের বাড়িতে প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছিল যে আমাদের বিয়ে হবেই। আজ আর কাল। তাই আজই যখন না বলে-কয়ে সন্ধ্যেবেলা রাইদের বাড়িতে এই সুসংবাদটি দিতে যাবো তখন রাই এবং রাই-এর মা বাবা খুব অবাক এবং খুশী হবেন।

মা কিন্তু খুশী হননি।

বলেছিলেন, এ কেমন উন্নতি যে, বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাটে উঠে যেতে হয়?

মাকে বলেছিলাম, আজকালকার চাকরীতে খাজনার চেয়ে

বাজনা বেশি। পার্টি দিতে হয়, পার্টিতে যেতে হয়, নইলে উন্নতি হয় না, ব্যবসা হয় না; জাতে ওঠা যায় না, পুরোনো পারিবারিক পরিবেশে ঠিক মানায় না। তাছাড়া সকলেরই আজকাল নিজের মত আছে। প্রত্যেক মেয়েই চায় যে, তার নিজের একটা আলাদা সংসার থাকুক, যে সংসারের সে নিজেই একা কর্ত্রী!

মা আমার ঘরের ইজিচেয়ারে আধাশুয়ে ছিলেন। মা সোজা হয়ে বসে বললেন, হয়ত তাই, সকলেই চায়; শুধু আজকালকার মেয়ে কেন সবকালের মেয়েরাই তাই চেয়ে এসেছে। কিন্তু না-পেলেই কী জীবন অসার্থক হয় রে খোকা? আমি ত পাইনি রে। তোর বাবা যখন মারা গেলেন তখন তুই আড়াই বছরের। মোটে পাঁচ বছর স্বামীর সঙ্গ পেয়েছিলাম। তারপব ত দাদার বাড়িতেই। তুই ছাড়া আমার কেউই ছিল না। তোকে বড করে মানুষ করে তোলাই একমাত্র চাওয়া ছিল জীবনে। কখনও নিজেব কথা ভাবিনি, নিজের দিকে তাকাইনি। ভেবেছিলাম শেষ জীবনে ছেলে-বৌ নাতি-নাতনী নিয়ে যা সময় থাকতে পাইনি তার স্বাদ পাবো, অনেক সাধ মেটাবো।

আমি বললাম, মেটাবেই ত? তুমি ত আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

মা বললেন, তা হয় না, সব মেয়েরাই সংসারের কর্ত্রী হতে চায়, তুই-ই বললি। সেখানে আমি থাকলে যদি তোর বৌ-এর সঙ্গে কর্তৃত্ব নিয়ে ঝগড়া হয়? সেটা খুব লজ্জার হবে।

আমি বললাম, রাইকে ত তুমি দেখেছো। রাই কি ওরকম মেয়ে?

মা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার চোখে মার চোখ।

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। হঠাৎ আমার মনে হল অনেক

বছর আমি মায়ের মুখের দিকে ভালো করে তাকাইনি। লেখাপড়া, খেলাধুলো, বন্ধু-বান্ধবী, ভবিষ্যৎ এই সব নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলাম যে, বহু বছর এই সংসারে আমার একমাত্র আপনজন আমার গর্ভ-ধারিণী মায়ের মুখেও তাকাবার অবসর হয়নি একবারও।

মায়ের ফর্সা মুখে নীল শিরাগুলো ফুটে উঠেছে। বেশ রোগা হয়ে গেছেন মা। চোখের কোণে কালি পড়েছে, চুলগুলো পেকে গেছে অলকের কাছে পুরোপুরি। চশমার আড়ালে মায়ের চোখ দুখানিকে বড় ক্লান্ত, আশাভঙ্গ দেখালো। মায়ের লো-ব্লাডপ্রেসার ডায়াবেটিস্…

আমি আবারও বললাম, তুমি এমন কেন করছ মা? রাই কি খারাপ মেয়ে?

মা হাসলেন। বললেন, সবাই ভালো। রাই ত খুবই ভালো মেয়ে। নইলে তোর পছন্দ হবে কেন তাকে? সে কথা নয়। কথাটা এই যে, আমি তোদের সঙ্গে থাকলে আমার যত-না অসুবিধে হবে, তোদের হবে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি মেয়ে হয়ে রাই-এর কথাটা যেমন বুঝছি তোর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হবে না। আমি যা বলছি সে তোদের সুখের জন্যেই। এখানে যখন তোরা থাকতে পারবি না, তখন আমিই এখানে…

আমি রাগ করে বললাম, তাহলে বলো চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিই। বিয়ে করারও দরকার নেই, সারাজীবন মামা-মামী এবং তোমার সেবা যত্ন করি?

মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, খোকা। আমি তা বলিনি তোকে।

তারপর কী যেন বলতে গিয়ে বললেন, আসলে আমি…।

বলেই, মা উঠে চলে গেলেন।

আমার ভালো মুডটা খারাপ হয়ে গেল।

কিন্তু কি করব? রাই এবং রাই-এর মা বাবা আমাকে এত ভালোবাসেন। এ একটা দারুণ ভালোবাসা। মা ত ছোটোবেলা থেকেই আমার। মা ত আমারই। পুরোনো মা। মায়েরা বড় অবুঝ হন। মুখে বলেন, তোমার ভালোই আমার ভালো, তোমার বৌ-এর ভালোই আমার ভালো। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কি চান তা স্পষ্ট করে বললেই হয়।

আমি আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

চুল আঁচড়াচ্ছিলাম আমি। আমার চেহারাটা ভালোই। প্রায় ছ ফিটের মত লম্বা শ্যামবর্ণ; শার্প ফিচারস আমার। দশ বছর থেকে টেনিস খেলে খেলে ফিগারটা পাঞ্জাবীদের মত—বাঙালীদের মত ট্যাড়শ মার্কা নয়। আমি স্মার্ট। ভালো ইংরিজী বলতে পারি। আমার ম্যানারস্ ভালো। ইংরিজীটা লিখিও ভালো—লোকে বলে। অফিসিয়াল কনফারেন্সে আমি ডিসকাসনস্-এ প্রিডমিন্যান্ট ভূমিকা নিই। পার্টিতে স্পার্কলিং কনভার্সেশনিসট্ বলে আমার সুনাম আছে। আমার অফিসের সিনিয়র অফিসারদের স্ত্রীরা আমার চার-পাশে ভীড় করে থাকেন যে কোনো পার্টিতে। রাই উইল হ্যাভ রীজনস টু বী প্রাউড বাউট ইট। এণ্ড আ লিটল জেলাস টু।

রাই-এর চেহারা এবং কথাবার্তাও একেবারে কেতাদুরস্ত। এ্যান আইডিয়াল ওয়াইফ অফ আ কভেনান্টেড অফিসার। আমরা এনগেজড্ হতে যাচ্ছি শুনে আমার ইমিডিয়েট বস্, আমাদের এস-ডি, সেলস ডিরেকটর আমাকে আর রাইকে ক্যালকাটা ক্লাবে একদিন ডিনারে ডেকেছিলেন। রাইকে দেখে এবং ওর সঙ্গে কথা বলে ত উনি প্রায় প্রেমে পড়ে যাবার যোগাড়। জানি না, আমার

প্রোমোশান ত্বরান্বিত করার পিছনে রাই-এরও কোনো ভূমিকা ছিল কি না। পরের দিনই এস-ডি অফিসে আমাকে ডেকে বলেছিলেন, কনগ্রাচুলেসানস্ টু উ্য। উ্য আর ভেরী লাকী। তবে এরকম ফুল তাড়াতাড়ি তুলে তোমাব ফুলদানী সাজাও। অন্য কেউ জানতে পেলে বিপদ তোমার।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম যে, রাইকে আমার ফুলদানীতেই আসতে হবে। সবদিক দিয়ে আমার মত ছেলে রাই কোথায় পাবে? কত ছেলেকেই ত ও জানতো। ভাবছিলাম, কাল যে উন্নতির কথা হল চাকরির, তার পিছনের কারণগুলো কি কি?

আমার চেহাবাটা ভালো মানলাম। কিন্তু আমাব আর আর যে গুণপনা, তার চেয়েও অনেক বেশি গুণপনাসম্পন্ন ছেলেদের আমি জানি।

যেমন সুবীরদা।

আমাকে বাড়িতে ম্যাথম্যাটিকস পড়াতেন যখন আমি ইণ্টারমিডিয়েট পড়ি। ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র। সেদিন দেখা হল অনেক বছর পর ড্যালহাউসীতে। হাতে ছাতা। শার্টের কলারের নীচে রুমাল দেওয়া, পাছে শার্ট একদিনেই ঘামে নষ্ট হয়ে যায়। একটা মার্চেণ্ট ফার্মে কেরানীর কাজ করেন। বি এস-সি পাশ করার পব আর পড়াশুনোই চালাতে পারেননি ওঁর বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায়। পাঁচজন ভাই-বোন ছিল। তাদের মানুষ করছেন। দু বোনের বিয়ে দিয়েছেন। নিজে বিয়ে করেননি। হয়ত আর করবেনও না। সময় পেরিয়ে গেছে। কি কাজ করেন শুধোতে বললেন, লেজার কীপার। খাতা লিখি। শিখে নিয়েছি।

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, অংকের ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র লেজার কীপার?

উনি বললেন, চাকরি ত আমার মতে হলো না, আমাকেই চাকরির মত হতে হলো।

আমি পরমুহূর্তেই নিজেকে ধমকে বললাম, ফরগেট ইট। প্রত্যেক অসফল লোকেরই একটা করুণ ছুতো থাকে। এই কারণে, সেই হয়নি। যেন বাবা অসময়ে না মরলেই সুবীরদা একজন দারুণ কেউ-কেটা হতেন!

মা একদিন বললেন, পুজোর দিন কটা থেকে গেলে হতো না?

আমি বললাম, না মা। কথা দিয়ে ফেলেছি।

পুজোর মধ্যে এখানে করার কি আছে? লাউডস্পীকারের চিৎকার, পথে-ঘাটে গ্রাম-গঞ্জের ঘেমো-গন্ধ লোকগুলো আদেখ্‌লার মত ভীড় করে আসে। জানাশোনা বন্ধুবান্ধব সকলেই প্রায় বাইরে যাচ্ছে। কেউ গাড়িতে, কেউ ট্রেনে, কেউ প্লেনে। কোভালম্‌, কুলু-মানালী, কাঠমাণ্ডু, গোয়া। বাড়িতে রুমিদা থাকলেও তাও হতো। অল্পবয়সী কেউ নেই। বুড়ো-বুড়ীদের উঃ আঃ। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, উপোস, গেঁটেবাত, ডায়াবিটিস্‌, সরবিট্রেট্‌, চ্যবনপ্রাস, সরবেকস-টি, ই-সি-জি, আকুপাংচার, ব্লাড সুগার, ক্লোরোস্ট্রল··· ইমপসিবল্‌।

শুকনো-কাশি, নাক-ভরভব, কান-কটকট, টি-ভি ম্যানিয়া, নয়ন-তারা ফুল-ভেজানো জল, করলার রস, প্রত্যহ প্রত্যুষে; শিবকালী ভট্টাচার্য—চিরঞ্জীব বনৌষধি—ভারতের সাধক এবং সাধিকা, কীর্তন-ভজন ইত্যাদি ইত্যাদি···

এখানে ছুটি কাটানোর চেয়ে কনসেনট্রেশান ক্যামপে থাকা ভালো।

তার উপর রাম। হতভাগা। এ-বি-সি-ডি-না জানা আটারলি—আনএডুকেটেড, বাটারলি স্পয়েল্ট ইরিটেবল্‌ ইরিটেটিং ওল্ড ফুল।

হি রিয়্যালী টেলস্ অন মাই নার্ভস দিজ ডেইজ।

এই পরিবেশের মধ্যে রাইকে এনে ফেললে অচিরে সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাতে হবে। রামের সঙ্গে ওর কম্যুনিকেশান গ্যাপটা এতই বড় যে, অসম্ভব।

মা যাই-ই বলুন, সেন্টিমেণ্টে যতই সুড়সুড়ি দিন, আমি রাইকে নিয়ে এখানে থাকতে পারবো না। আফটার অল আই হ্যাভ ওনলি ওয়ান লাইফ টু লিভ। আগের জেনারেশানের ইডিয়টদের মত আমরা মা-বাবার দেখাশোনা করে, তাদের ন্যাগিং সহ্য করে, তাদের যাবতীয় ইনকনসিডারেশানের শিকার হয়ে একটা মানডেন্, বোরড্ ফানলেস কনস্ট্রেইনড জীবনযাপন করতে রাজী নই।

অন্যকে দুঃখ না দিলে নিজে সুখী হওয়া যায় না। এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টরা বলেন, এভরী ডেবিট হ্যাজ আ ক্রেডিট। অন্যর প্রতি কনসিডারেশানের জীবন হচ্ছে সিঙ্গল এনট্রির জীবন···আলটিমেটলী নো-এনট্রির, নন-এনটিটির জীবন।

ন্যাও। আই অ্যাম দ্য লাস্ট পার্সন টু একসেপট দ্যাট। আমি এই প্রজন্মের ছেলে। আমরা স্বয়ম্ভু। আমাদের পূর্বপুরুষ ছিল কিন্তু তাদের প্রতি কোনো দায়িত্ব কর্তব্য মমত্ব আমাদের নেই। তারা না থাকলেও আমাদের ক্ষতি ছিলো না। ক্ষতি হবে না ভবিষ্যতে। সেই সব প্রি-হিস্টরিক সিলী ভ্যালুজ ও ফিলিংস আমরা এই জেনারেশানের ছেলেমেয়েরা টোটালী ডিস্কার্ড করেছি।

দে ওয়্যার আ ডিফারেণ্ট ক্লাস এণ্ড উই আর ডিফারেণ্ট। মামা, মামী ও মায়েদের সঙ্গে আমাদের অনেকগুলো জেনারেশানের গ্যাপ হয়ে গেছে।

একটা শ্রেণীগত বিভেদ।

৮

দেখতে দেখতে মহালয়া এসে গেল। মহালয়ার আগের দিন রাতে রাইদের গাড়ি এসে আমাকে তুলে নিয়ে গেল স্টেশনে।

টু-টায়ারের টিকিট কাটিনি। কেটেছিলাম ফারসট ক্লাসেরই। ফারসট ক্লাসের বাথরুম দেখেই রাই নাক সিঁটকাল। বলল, কোনো ডিসেণ্ট লোকের পক্ষে এরকম বাথরুম ইউজ করা সম্ভব নয়। ঈসস্ কীরকম সব···এ্যাঁ!

আমি বুঝতে পারছিলাম যে, রাই অন্য গ্রহের লোক। এমন কোনো গ্রহ যা এখনও ভয়েজারের চোখেও ধরা পড়েনি। কিন্তু কী করব! আমি মানুষটাই এ্যাডভাঞ্চারাস। ভালবাসলামও যদি, তাও অন্য গ্রহের, অন্য শ্রেণীর মানুষকে।

আমরা দুজনে একা যাচ্ছি না। যেতে পারতাম। সঙ্গে তৃতীয়-জনের আবির্ভাব রাইয়েরই ইচ্ছায় কি না জানি না। রাইয়ের সঙ্গে রাইয়ের এক ফারসট্ কাজিন শ্রীও যাচ্ছে। লোরেটো হাউসে পড়ে। হাঁটুতে চামড়ার তালি লাগানো জিনস্। গায়ে একটা হলুদ গেঞ্জী। দুই স্তনের কাছে লাল অক্ষরে লেখা, বুবস, বী কেয়ারফুল বেইবী।

অহো! কী আনন্দের। দেশটা একেবারে এ্যামেরিকা হয়ে যাচ্ছে। বাঙালী মেয়েরা শাড়ি পরতে ভুলে গেছে—যখন সারা পৃথিবীর মেয়েরা শাড়ির জন্যে পাগল।

রাইকে আমার এই জন্মে ভালো লাগে। আলট্রা মডার্ন হয়েও ও ওর বেঙ্গলীনেসটা কেয়ারফুলি প্রিসার্ভ করেছে। মাঝে মাঝেই শাড়ি পরে। আজ লো-কাটের অফ হোয়াইট ব্লাউজ। দুটি হলুদ স্ল্যাজেঞ্জার টেনিস বলের মত তার পাখসাট আঁটসাট স্তন দুটির আভাস দেখা যাচ্ছে। কী মসৃণ; নম্রতাময় শক্ত; কী আঁখিলোভা! শান্ত শ্বেতা পাখির মত সুন্দর পায়ের পাতা ঘিরে কালো নরম লেদারের চটি—ফলস্ লাগানো হালকা লাল শাড়ির কালো পাড় লুটিয়ে পড়েছে। রূপোর পায়জোড় ঘিরে রয়েছে পায়ের গোড়ালি।

কম্পার্টমেন্টে আমরা তিনজন। শ্রী বলল, লেটস প্রে, যেন আর কেউ না ওঠে।

রাই বলল, আচ্ছা থার্ড ক্লাসগুলোকে সেকেণ্ড ক্লাস করল কেন? আজকাল ট্রেনে ত আর থার্ড ক্লাস দেখি না।

আমি বললাম, তা ত তোমার বাবাকে জিগগেস করলেই পারতে। আসলে শ্রেণী ব্যবস্থা উঠে যাচ্ছে ত এ দেশ থেকে। ওঁরা একটা দাঁড়ি মুছে দিয়ে সহজে সকলকে সমান করে দিলেন। ক্লাসলেস সোসাইটি গড়লেন।

শ্রী বলল, ঋদ্ধিদা, উ্যা সাউণ্ড কম্যুনিস্টিক্। জ্যাঠা জানতে পারলে কিন্তু খুবই পারটার্বড্ ফীল করবেন। হি কানট স্ট্যাণ্ড কম্যুনিস্টস্।

আমি হাসলাম। বললাম, ভয় নেই। তোমারও নেই। তোমার জ্যাঠারও নেই। এদেশে কোনো সত্যিকারের কম্যুনিস্ট নেই। এদেশীয় কম্যুনিজম ভাববাচ্যের কম্যুনিজম। মাভৈঃ! লেনিনের কথাতেই বলতে হয়···

শ্রী ও রাই দুজনেই চোখ বড় বড় করে বলল, তুমি ওসব পড়ো নাকি?

আমি হাসলাম, বললাম, কেন? লেনিন কি পর্ণোগ্রাফী লিখতেন? পড়াও কি দোষের?

তা নয়। তবে···

তবে কি?

কিছু না। তার চেয়ে গান শোনো। বলেই, শ্রী ওর টেপ রেকর্ডারের বোতাম টিপল।

„লাভ ফর্ সেল।

এ্যাডভার্টাইজিং ইয়াং লাভ ফর সেল······

লটস্ এণ্ড লটস্ অফ ইয়াং লাভ ফর সেল······।"

আমি বললাম, কি গান এটা?

ওরা দুজনেই অবাক হয়ে বলল, ওমা। শোনোনি? বণি এম-এর গান। ফেমাস।

প্লাটফর্মের উপরে একদল মানুষ বসেছিল পুঁটলী নিয়ে। পায়-খানায় বসার মত করে বসেছিল ওরা। থার্ড ক্লাস, স্যরী, সেকেণ্ড ক্লাসের নন-রিজার্ভড কামরায় চড়বে এরা পরের ট্রেনে। ওদের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনের সব গাড়িতেই নন-রিজার্ভড সীটে ওদের আনাগোনা। প্রতিটি মুহূর্তেই ধস্তাধস্তি। বেঁচে থাকার জন্যে, একটু বসার জন্যে, একমুঠো খাওয়ার জন্যে।

বসে বসে গায়ে শক্তি সঞ্চয় করছিল ওরা। একটু পরই যুদ্ধ করে কোনোক্রমে ট্রেনে একটু বসার জায়গা করতে হবে ওদের। ওরা টিকিট কেটেছিল। শহুরে গরীবদের মত ওরা ধাউড় হয়নি এখনও। হবেও না হয়ত কখনও। ক্ষুধাতুর বাচ্চারা কাঁদছিল। মায়ের শুকনো

রুক্ষ শুষ্ক স্তন নিয়ে পথের কুকুরের বাচ্চাদের মত কামড়া-কামড়ি করছিল। আমি রাই এবং শ্রীর বুকের দিকে তাকালাম। এয়ার-কণ্ডিশানড মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা নীল কাঁচ-ঢাকা জানালার বুক ওদের। আর প্লাটফর্মের মেয়েটির বুক?

থার্ড ক্লাস।

স্যরী, সেকেণ্ড ক্লাস!

যার যেমন যোগ্যতা। ঐ মেয়েটির স্বামী এ-বি-সি-ডি শেখেনি, গরীবের ঘরে জন্মেছিল। আমাব মত ইংরেজী বলতে পারে না, লিখতে পারে না, এমন কি নিজেকে নিয়ে নিজের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববে এমন অবকাশ ও মেধাও ওর নেই। ওর বৌ প্লাটফর্মে বসে থুঃ থুঃ করে তামাক পাতা চিবিয়ে ফেলবে আর ওর বাচ্চারা তার স্তন কামড়া-কামড়ি ত করবেই। ওরা ত ঋদ্ধি মজুমদারের বৌ নয়, প্রদীপ সেনের বৌও নয়। ওরা আন-এডুকেটেড, এ-বি-সি-ডি না-জানা মানুষ, নবীন মুহুরীর ভাষায়।

আমাদের কম্পার্টমেণ্টে কেউই আর ওঠেনি। ট্রেনটা ছেড়ে দিল। কণ্ডাকটর গার্ডকে ঘুষ দিয়ে রেখেছিলাম আমি, পাছে পথে টাকা নিয়ে কাউকে ঢুকিয়ে দেয়।

ঘুষই একমাত্র ড্রাইভিং ফোর্স এখন।

ঘুষ দিতে ও নিতে এখন আর কোনো ভারতীয়র হাত কাঁপে না। আমরা সব স্তরেই এখন এই ব্যাপারটাকে অমোঘ ও অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছি। বিবেকের কম্পার্টমেণ্টটিকে কনভিনি-য়েণ্টলী এবং এ্যাজ আ ম্যাটার অফ নেসেসিটী সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে দিয়েছি মনের ট্রেইন থেকে।

শ্রী ও রাই ঘরের আলো নিবিয়ে আমাকে একটু বাইরে যেতে

বলল—। ওরা নাইটি পরবে। খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের। ফ্লাস্কে করে চিকেন ক্র্যাব স্যুপ আর হটবক্সে চিকেনরোস্ট, ব্রেড-রোলস্ চীজ এবং ক্যারামেল পুডিং পাঠিয়েছিলেন রাইয়ের মা।

রাই বলছিল, আজকালকার দিশি চীজ মুখে দেওয়া যায় না। ক্র্যাফট চীজ, ড্যানিশ বা সুইস বা অস্ট্রেলিয়ান চীজ আজকাল পাওয়াই যায় না।

আমি করিডরে যখন দাঁড়িয়েছিলাম, দরজার কাছে, ট্রেনটা তখন একটা বস্তীর সামনে থেমে ছিল।

এখনও হাওড়া থেকে বেশি দূরে আসিনি। ছেঁড়া শাড়ি পরা উদলা বুকের চুলখোলা একজন মেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে কাকে যেন আরো মারো বলছিল ; বলছিল, মাইর‍্যা ফেলাও আমারে মাইর‍্যা ফেলাও। হাওয়াল মাইয়াগুলারেও বিষ খাওয়াও। এই কষ্ট—এই বাজার—এই কয়ডা টাহায় আমার দ্বারা তোমার সংসার চালান অইব না। আমি পারুম না। আর পারি না!

যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে খালি গায়ে, অনুতপ্ত মুখে গোঁজ হয়ে বসেছিল। লোকটার মুখ খুব চেনা মনে হচ্ছিল। ওকে আমি চিনি মনে হল। খুব চিনি। কিন্তু ইচ্ছে করে মনে রাখি না। মনে রাখতে ভয় হয় বলে। পাছে ও আমার চোখের দিকে তাকায়।

আমি মুখ নামিয়ে নিলাম।

দরজা খুলে শ্রী বলল, এসো। আমি কম্পার্টমেন্টে ঢুকলাম। সুন্দর পারফ্যুমের গন্ধ। রাই মেখেছে। গন্ধটা আমার চেনা। ইন্টিমেট? না, না, ইন্টিমেট বোধহয় আজকাল সকলেই মাখে। তার চেয়েও দামী কিছু।

শ্রী হাতে হ্যাণ্ড-লোশান মাখছিলো শোবার আগে। রাই চুল আঁচড়াচ্ছিলো। ওকে হালকা নীল-রঙা নাইটিতে হাত উঁচু করে চুল আঁচড়াতে দেখে আমার হঠাৎ ঝড় উঠলো শরীরের ভিতর। রাই আমার। আমারই একার।

আমি জানতাম, আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না।

শ্রী বলল, ঋদ্ধিদা, তুমি কি বই পড়বে? না, আলো নিভিয়ে দেব?

রাই বলল, নীল আলোটা জ্বালিয়ে রাখ, নইলে রাতে বাথরুমে-টাথরুমে যেতে অসুবিধা হবে।

শ্রী আলো নেবাল। নীল আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াল।

আলো নেবানোর আগে রাই আমার দিকে চাইল চোখ তুলে।

আমি একটা ফ্লাইং কিস্ ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে নিঃশব্দে।

মুখে বললাম, গুড নাইট।

ওর মুখটা একটা চাপা হলুদ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়েই নীল আলোতে নীল হয়ে গেল।

ও অস্ফুটে বলল, গুড নাইট। হাত নাড়ল। নীল আলোতে ওর হাতের হীরের আংটিটা ঝিকমিক করে উঠল।

শ্রী বলল, গুটেন ন্যাকট্।

ও জার্মান শিখছে। মেয়েটা ভালো।

জার্মান ও খুব তাড়াতাড়ি শিখছে। ফ্রেঞ্চ ত জানেই। কিন্তু শ্রী রবীন্দ্রনাথ পড়েনি। মানিকবাবুর পদ্মানদীর মাঝি পড়েনি, বিভূতি-বাবুর আরণ্যক পড়েনি, পড়েনি সুকান্ত। সংস্কৃত অক্ষর চেনে না। ওরাই অধুনা শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রতিভূ। ভালো মেয়ে। ও-ও আমারই মত হলুদ ব্যাংলনের গেঞ্জী আর জিনস্-পড়া হ্যারলড

রবিনস-এর ভক্ত একজন কভেনান্টেড অফিসারকে বিয়ে করবে। রবিবার স্বামীর সঙ্গে লাল গেঞ্জী পরে গলফ খেলতে যাবে। নয়ত ক্লাবে গিয়ে শ্যান্ডি খাবে। রামের বাবা দশরথ, রাম রামকৃষ্ণ সকলকে ইংরেজ মেমসায়েবরা যেমন ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতেন ডার্টি নিগার, তেমন করেই শ্রীও বলবে ; তবে নিরুচ্চারে।

ভোরবেলা আমরা বড় স্টেশানে এসে পৌঁছলাম। রাইয়ের দাদা রূপদা, রূপ মুখার্জী, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে ধবধবে সাদা পোশাকের টুপী পরা ড্রাইভার এবং দুজন আর্দালী।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল রাই। রূপদা ঝুঁকে পড়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন, বললেন নাইস মীটিং উ্য।

তারপর পাইপটা খোঁচাতে খোঁচাতে শ্রীকে বললেন, তোদের জন্যে আমার মর্নিং ওয়াক হয়ে গেল। আমি ত এ-সি কোচের সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। ওখানে না পেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এলাম। ভাগ্যিস সেকেণ্ড ক্লাসে আসিসনি—কোম্পানীর লোক এই ট্রেনে যাতায়াত করে। আমার বোনকে একগাদা ছোটলোকের সঙ্গে রাত জাগা নোংরা শাড়িতে প্ল্যাটফর্মে নামতে দেখলে একেবারে ইজ্জত ঢিলে হয়ে যেত।

আমার ধাক্কা লাগল একটা। সেই ভোরে মিষ্টি মিষ্টি পুজো পুজো ঠাণ্ডা হাওয়ায় বিহারের এক স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমার হবু-স্ত্রীর দাদার কথা শুনে সেই প্রথম মনে হল আমার যে, বোধহয় এখানে আসাটা অন্যায় হয়েছে। এও মনে হল যে, রাই-এর সঙ্গে সারা জীবনের সম্পর্ক পাতার আগে আমার আরো একটু ভাবা দরকার।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

বড়লোক আমি অনেক দেখেছি জীবনে—। বড়লোক বেষ্টিত হয়েই বড় হয়ে উঠেছি। কিন্তু বড়লোকদের মধ্যে বহু ভালো লোককেও দেখেছি যারা নিজেরা ভাগ্যবান বলেই ভাগ্যহীনদের কথাও ভাবেন। বড়লোক মাত্রই যে খারাপ এবং গরীবমাত্রই যে ভালো এমন ফালতু অন্য-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত শ্লোগানে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু রাইয়ের দাদা বড়লোক নন। তাঁর গাড়ি, উর্দিপরা ড্রাইভার, তাঁর কোম্পানী সম্বন্ধে শ্বশুরমশাইসুলভ শ্রদ্ধাভক্তি, সেকেণ্ড ক্লাস থেকে বোন নামলে বেইজ্জৎ হওয়া; এসবই তাঁর অহেতুক চাকুরেসুলভ মনোবৃত্তি। সত্যিকারের বড়লোকের দম্ভ সহ্য করা গেলেও বা যায়; কিন্তু বড়লোকের চাকরের দম্ভ সহ্য করা মুস্কিল।

শ্রী রূপদার কথায় হেসে উঠেছিল।

বলল, রূপদা এমন করে বোলো না। ঋদ্ধিদা মাইণ্ড করবেন। ঋদ্ধিদা যে কম্যুনিস্ট।

আমি কিছু বলার আগেই রূপদা বললেন, নো-প্রবলেম। আমার কাজ লেবার নিয়েই। কম্যুনিস্ট ঠাণ্ডা করার কৌশল আমার জানা আছে। এবার চল এগোই।

আমি নিজেকে সপ্রতিভ বলেই জানতাম। কিন্তু খুব অপ্রতিভ হয়ে রইলাম। যেখানে আমার মর্যাদা বা মনুষ্যত্ব হোঁচট খায় সেখানে আমি আমার নিজ সত্তা থেকে সরে আসি। তখন আয়নায় নিজের মুখ দেখলেও কেমন বোকা বোকা লাগে। মুখে কথা সরে না, যদিও মনের মধ্যে ফুটন্ত ভাতের মত কথা ফুটতে থাকে তখন।

ওভারব্রিজ পেরিয়ে এসে দেখলাম একটা ঝকঝকে কালো অ্যামবাসাডর গাড়ি—সাদা সীট-কভার লাগানো। তার পিছনে একটা জীপ—তাতে মালপত্র যাবে।

একজন বেয়ারা জীপ থেকে দুটো ফ্লাস্ক বের করে আনল। আরেকজন ট্রেতে গ্লাস ও কাপ সাজিয়ে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথম বেয়ারা একটা ফ্লাস্ক থেকে কমলালেবুর রস ঢেলে দিল দুটো গ্লাসে। আর অন্যটা থেকে চা ঢালল দুটো কাপে। তারপর চা দিল আমাকে আর রূপদাকে, ফলের রস দিল ওদের দুজনকে।

তারপরই প্রথম বেয়ারা ফিরে গিয়ে একটা ছোট্ট চীনামাটির বাটিতে করে যেন কী নিয়ে এল।

দেখলাম, দু কোয়া রসুন এবং দু মুঠো মুড়ি।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। একবার রাইকে আমি বলেছিলাম যে, সকালের প্রথম-কাপ চা, আমি দু মুঠো মুড়ি ও দুটো রসুন খেয়ে খাই।

রূপদা বললেন, ঋদ্ধি! আমার চাকরিটা আছে ত? এ্যাজ আ হোস্ট?

আমি বললাম, এসব কি? একদিন ব্যতিক্রম হলে কি হতো? আমি কি ইন্দিরা গান্ধী না ইণ্ডিয়ার এ্যামবাসাডর। ভাঁড়ের চা খেতে কী ভালো যে লাগত—ফর আ চেঞ্জ।

শ্রী হাসছিল ফলের রস সিপ্ করতে করতে।

আমাদের ঐ সাতসকালে ইস্টিশানের চত্বরে দাঁড়িয়ে সেরিমনিয়স্‌লি ওসব খেতে দেখে কুলী, ভিখিরি, সাধারণ লোকদের এবং ঘেয়ো কুকুরের রীতিমত ভীড় জমে গেল চার পাশে। শ্রী ও রাইয়ের সুন্দর চেহারা, পোশাক; এবং রূপদার পাইপ এবং উর্দিপরা লোকজনও ভীড় হওয়ার অন্য কারণ।

শ্রী হাসতে হাসতে বলল, ঋদ্ধিদা, তুমি কি মুড়ি খাও। আনথিংকেবল্। প্রি-হিস্টরিক্! মুড়ি কোনো ভদ্রলোকে খায়?

আমাদের বেয়ারারা আর ঝি মুড়ি খায় দেখেছি ব্রেকফাস্টে। কখনও খেয়ে দেখিনি জীবনে। দাও ত একমুঠো খেয়ে দেখি।

আমি বললাম, নাও।

ও বলল, নাঃ বাবা থাক। কী আনহাইজিনিক্ কণ্ডিশানস-এ বানায় তা কে জানে? আমার বাবা একদম ইমিউনিটি নেই। নাই-ই বা খেলাম। মাম্মী জানলে বীষণ রাগ করবে।

চা ও ফ্রুট জ্যুস্ খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে, সামনে রূপদা। পিছনে আমরা তিনজন। ডানপাশে শ্রী, মধ্যে রাই, রাই-এর পাশে আমি। পিছনে পিছনে জীপ আসছে বেয়ারাদের নিয়ে। কখন কার কী দরকার হয়।

হু হু করে সুন্দর রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে। চতুর্দিকে পাহাড়, জঙ্গল; সূর্যটা সবে উঠছে। শিশির ভেজা জঙ্গল থেকে সুগন্ধি হাওয়া ভেসে আসছে।

রূপদা বললেন, বল রাই? তোদের জন্যে আর কি কি করব? একদিন রাখিয়াতে পিকনিক, ক্লাবে একদিন ডিসকো-নাইট, সুইমিং এণ্ড টেনিস। স্যরী, গলফ নেই এখানে ঋদ্ধি। ইচ্ছে করলে অবশ্য খেলতে পারো, আমার বাংলোর লনেই একটা মিনি কোর্স্ আছে। শিকার করতে চাইলে, তাও হবে। ওয়াইল্ড বোর, ভালুক, মুরগী, তিতির। বীটিং-এর বন্দোবস্ত করে রেখেছি। এণ্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট মহুয়া খাওয়ার আর এবরিজিনালদের ডান্স—একেবারে ওদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে দেখাবো।

আমার মনে পড়ে গেল নবীন মুহুরীর কথা। টিপ-টিজ্ দেখবেন স্যার?

আমি বললাম, শুনেছিলাম এখন সারা দেশেই শিকার করা বন্ধ।

হ্যাঁ। আইনে সেরকমই বলে। কিন্তু কোন আইনটা লোকে মানে এদেশে? শুধু শিকারের আইনটাই মানতে হবে তার কি মানে আছে? তাছাড়া, এ অঞ্চলের ডি-এফ-ও আমার বন্ধু—হি ওকেশানালী ড্রপস্ ইন দ্য ক্লাব ফর আ ড্রিঙ্ক অর টু। নাইস, ইয়াং চ্যাপ। নট ওয়ান অফ দোজ লং-ফেসেড, হাফ-উইট প্রোমোটীজ; যারা কেরানী থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে উপরে। উ্য নো।

বলে কাঁধ শ্রাগ করলেন।

আমি বললাম, ও।

রূপদা আবার বললেন, তুমি সরকারী চাকুরেদের সঙ্গে যোগা-যোগ কতটা রাখো জানি না, তবে সব সরকারী অফিসে অনেকগুলো ক্লাস আছে। ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফোর। ক্লাস ওয়ানের মধ্যে আবার দুটো ক্লাস, ডাইরেকট রিক্রুট; যারা কমপিটিটিভ পরীক্ষাতে পাশ করে আসে। আর প্রোমোটীজ। দু দলে একেবারেই মিল নেই। মন কষাকষি আছেই। গেজেটেড অফিসারদের জন্যে আলাদা ল্যাভাটরী, কেরানীদের জন্যে আলাদা।

আমি বললাম, যাঁরা নীচু থেকে কাজ শিখে উঠেছেন তাঁরা কাজ জানেন না কি রকম?

আরে অফিসার-লাইক কোয়ালিটীই নেই। কেরানী, চিরকাল কেরানীই থাকে। অফিসারের ব্রিডটাই আলাদা। শেটল্যাণ্ড পনির মত; পিকিনিজ কুকুরের মত; পেডিগ্রী বলে কতা।

আমি ঠিক বুঝলাম না। মায়ের পেট থেকে পড়েই লোকে অফিসার হয় কি করে? আর্মির ডাইরেকট্ রিক্রুটমেণ্টে অফিসারদের কী ট্রেনিং দেওয়া হয় তা আমি জানি—তাতে অফিসার সত্যিই অফিসারসুলভ গুণ নিয়ে এসে জয়েন করে। অনেক জওয়ানের জীবনের দায়িত্ব হাতে

নিয়ে। তাদের তেমন করেই তৈরী করা হয়—কারণ জীবন-মৃত্যু নিয়ে তাদের কারবার। ফাইল নিয়ে নয়। কিন্তু অন্য সরকারী ডিপার্ট-মেণ্টের সব জায়গায় আর্মির মত ট্রেনিং হয় বলে শুনিনি। কিছু চাল-চালিয়াতি শেখানো হয়, বাত-বাতেল্লা ; এক ধরনের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেকস্ তৈরি করে নতুন এক বুর্জোয়া শ্রেণী তৈরী করা হয় বলেই ধারণা।

আলট্রা-মডার্ন বুর্জোয়া ব্যুরোক্র্যাটস্। যাদের কাজ দেশকে এ্যাডমিনিস্টার করা অথচ দেশের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে যাদের বেশির ভাগেরই কোনো সাযুজ্য নেই।

রূপদা বললেন, কি হল ঋদ্ধি? চুপচাপ কেন?

তারপর বললেন, রাই, একটা গান শোনা।

আরও কিছু!

এই চলন্ত গাড়িতে গান হয় না কি? রাই বলল।

টেপ শুনবে? শ্রী বলল।

রাম সিং, গাড়ি রোকো। রূপদা বললেন।

গাড়িটা দাঁড়াল।

এখানেও রাম সিং। লোকটার গোঁফ আছে। ধবধবে সাদা ইস্ত্রী-করা পোশাক এবং টুপী ছাড়া আসল লোকটা কেমন দেখতে হতে পারে আমি অনুমান করছিলাম।

লোকটার নামও রাম।

হবেই, আমি জানতাম।

ও বিহারের লোক বলে সিং। ও কি বাড়িতে লুঙি পরে, না ধুতি? না কি পাজামা পরে? ওর কোয়ার্টারের সামনে এই লোকটাই খালি গায়ে চৌপাই-এর উপরে বসে রোদ পোয়ায়। ওর পায়ের কাছে

ওর পোষা কুকুর শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কুঁক কুঁক করে বৃথাই নখ দিয়ে পিঠের আঠালী তোলার চেষ্টা করে। ওর পাশে ওর দু বছরের ছেলে বসে থাকে। মুঠো করে ওর বুকের চুল ধরে। নিমগাছে কাক ডাকে। ঘরের মধ্যে ওর বৌ আটা মাখে। আলুর চোকা, আমলার আঁচার আর রুটী বানাবে বোধহয় ওর বৌ।

কি নাম ওর বৌয়ের? নিশ্চয়ই রাই নয়। না না, শ্রীও নয়। ফুল্‌রসিয়া, না সুরাতীয়া; না লছমী? লক্ষ্মী? হতে পারে। সীতাও হতে পারে। রাম সিং লোকটা ভাল। লোকটা আসলে যা নয়, ওকে তাই-ই সেজে ওর মালিকের চাকরি করতে হয়; কারণ ওর মালিকও নিজে যা নয় তাই-ই সেজে থাকতে ভালোবাসে।

রাম সিং-এর কাঁধে একটা গামছা থাকলে ও একটু মুখটা মুছত। বাড়িতে নিশ্চয়ই সব সময়ই থাকে। এখন ঘাড় সোজা করে সামনে তাকিয়ে রয়েছে রাম সিং। যেন ওর স্পণ্ডিলাইটিস হয়েছে। এইটেই নিয়ম। বড় সায়েবদের গাড়ি চালাবার সময় চোখে ঠুলী পরানো, কানেকালা; ঘাড়-সোজা জন্তুর মত শক্ত হয়ে বসেই গাড়ি চালাতে হয়। ও-ও যে একটা মানুষ, ওর-ও যে কান চুলকাতে পারে, নাক সুড়-সুড় করতে পারে; একটা বিড়ি খেতে ইচ্ছে করতে পারে এসব কথা কোম্পানী মানে না। তার সাদামাটা কালো-কোলো চেহারাকে জবরজং পোশাক মুড়ে মালিক তার স্ট্যাটাসের প্রতীক করে দেখতে ভালোবাসেন। যেমন ভালোবাসেন মালিকের মালিক। মালিককে।

গাড়িটা থেমে ছিল। বাইরে পাখি ডাকছিল। নানারকম। গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছিল। তাছাড়া অনুভব করে মুগ্ধ হচ্ছিলাম যে জঙ্গলে নিঃশব্দতারও একটা আশ্চর্য সুরেলা শব্দ আছে। সে বড় ভরন্ত শব্দ।

জীপটাও দাঁড়িয়েছে পেছনে। বেয়ারা দৌড়ে এল চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে।

শ্রীর টেপ রেকর্ডারটা অতর্কিতে জোরে বেজে উঠল। "ইটস্ ওয়ান স্টেপ্ ফ্রম দ্য জাঙ্গল টু দ্যা জু উ-উ—

ওয়াচ্ আউট্!

অর দে গন্না গেট য়্যু টু-উ-উ।

গানটার কথাগুলো শুনে আমার মজা লাগল। এই জঙ্গল এবং জঙ্গলের পটভূমিতে রূপদা!

গানটাকে দারুণ অর্থবাহী মনে হল।

গাড়িটা আবার স্টার্ট করল রাম। স্যরী, রাম সিং।

শ্রী বাবল্গাম চিবুতে চিবুতে বলল, ইজিনট দ্যা সং লাভলী?

রূপদা বললেন, লাভলী।

তারপর বললেন, তোর বউদিকে একটু এ-সবে ইণ্টারেস্টেড করে তোল্ ত। একেবারে গাঁইয়া ভেতো বাঙালীই রয়ে গেল। নাচতে চায় না ক্লাবে গেলে, ড্রিংক করে না, আমার সোস্যাল লাইফ একেবারে হেল্ করে দিলে পাঁচ বছরে। এক রবীন্দ্রনাথ আর কতগুলো ওয়ার্থলেস মডার্ন বাঙালী লেখকের ট্র্যাশ বই ছাড়া কিছুই পড়বে না। গান শুনবে, তাও এ্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ আর অতুলপ্রসাদ। যত ন্যাকা-কান্না সব গান। আমার ত শুনলে হুইস্কীর নেশাই ছুটে যায়।

গাড়িটা চলতে লাগল। টেপ রেকর্ডার বাজতে লাগল।

রাই বলল, এখানে ত এখনই বেশ মিষ্টি ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। তাই না দাদা?

সেই জন্যেই ত আসতে বললাম এখন। শীতে আমাদের অভ্যেস

হয়ে গেছে, তোদের কষ্ট হতো। বড় বেশি শীত তখন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর দূরে কারখানাটা দেখা গেল অনেক মাইল এলাকা জুড়ে।

এখন যেখান দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছে তার দু পাশে দারুণ কতগুলো বাংলো।

শ্রী বলল, এগুলো কাদের বাংলো?

রূপদা বললেন, এটা জোনাথন ব্লক। বড় সাহেবদের বাংলো সব এখানে। টম জোনাথন বলে এক সাহেব এসে এই কারখানার গোড়া পত্তন করেছিলেন আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। সেই সময় থেকে বড় সাহেবদের ব্লককে জোনাথন ব্লকই বলে।

এর পরই পড়বে আমাদের ব্লক। রোজমারী ব্লক। তার পরে সিয়েরা ব্লক, আমাদের নীচে যে সব অফিসার আছে, সেখানে তাদের কোয়ার্টার। তারপর দাদাচাঁদজী ব্লক। তারপর নানক্ সিং ব্লক আর দয়াময়ী ব্লক,—কারখানার কাছাকাছি ক্লাস-ফোর ক্লাস-ফাইভের এমপ্লয়ীদের জন্যে। কুলীদের ও অন্যান্য নন-ডেসক্রিপ্ট লোকেদের জন্যে এদিকে ওদিকে পাকা বস্তী আছে।

শ্রী বলল, কারখানার কাছে তোমরা থাকো না কেন?

মাথা খারাপ। গরমের সময় যা গরম হয় না কারখানার কাছে, সে আর বলার নয়। তাছাড়া অনেক সময় কারখানায় এ্যাকসিডেণ্ট হয় ছোটখাটো, বিশেষ করে গরমের সময়। দূরে থাকাই ভাল।

শ্রী বলল, তোমাদের বাংলোগুলো এয়ারকণ্ডিশানড্ নয় বুঝি?

রূপদা বললেন, না, স্যার। তবে দুটো করে বেডরুমে এয়ার-কণ্ডিশানার লাগিয়ে দিয়েছে কোম্পানী। বড় সাহেবদের পুরো

বাংলোই, মানে লিভিং, ডাইনীং এবং বেডরুমগুলো সব সেণ্ট্রালী এয়ার-কণ্ডিশানড্।

শ্রী বলল, তুমি কবে জোনাথন ব্লকে যাবে ?

রূপদা হাসলেন। বললেন, সে কি আমার হাত ? রোজমেরী ব্লকের প্রত্যেক অফিসারই তাকিয়ে থাকে জোনাথন ব্লকের দিকে। কবে সেখানে যাবে। তবে এখানে যা খেয়োখেয়ি তেলাতেলি পলিটিকস্, কার কখন প্রমোশন হয় কেউই জানে না।

রাই বলল, তাহলে সিয়েরা ব্লকের লোকেরা চেয়ে থাকে রোজমেরী ব্লকের দিকে ?

হ্যাঁ। আর দাদাচাঁদজী ব্লকের লোকেরা সিয়েরা ব্লকের দিকে, নানক্ সিং ব্লকের লোকেরা দাদাচাঁদজী ব্লকের দিকে। এবং দয়াময়ী ব্লকের লোকেরা নানক্ সিং ব্লকের দিকে। রূপদা বললেন।

রাম সিং একটা সুন্দর বাংলোর গেটে গাড়ি ঘুরিয়ে, হর্ন দিলো। লনের দুদিক থেকে দুজন মালী দৌড়ে এসে দুদিকের গেট খুললো। একটা এ্যালসেসিয়ান কুকুর ভাক্ ভাক্ করে ডাকতে ডাকতে লনে লাফালাফি করতে লাগল। আমি শুনলাম, ভাগ্ ভাগ্।

গাড়িটা নুড়ি-বিছানো ড্রাইভ দিয়ে কির্ কির্ শব্দ করে এগিয়ে গিয়ে পোর্টিকোর নীচে দাঁড়াল।

একজন মহিলা, হলুদ তাঁতের শাড়ি পরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন।

আমরা আসতেই আপ্যায়ন করে বললেন, আসুন আসুন। আয় রাই, এসো শ্রী। বাবাঃ এলে শেষকালে ? এতদিনে সময় হলো তোদের ?

রূপদা আলাপ করিয়ে দিলেন, এই যে সুপর্ণা—আমার স্ত্রী।

এই ঋদ্ধি।

ভদ্রমহিলাকে রাই-এর সমবয়সী বলেই মনে হলো। রাই-এর দাদার সঙ্গে বউদির বেশ তফাৎ বয়সের।

রাই বলল, এ্যাই স্থপা, আমরা ত তোর ঘরের লোক—আমাদের দেখাশোনা করতে হবে না তোর। তুই এই বাইরের লোককে নিয়ে গিয়ে ঘর দেখিয়ে দে। রাত জেগে এসেছে—আরাম করুক।

উনি হাসলেন, বললেন, ভাগ্যিস বললি, নইলে বাইরের লোককে বাইরেই বসিয়ে রাখতাম।

স্থপা মানে রূপদার স্ত্রী আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন। একজন বেয়ারা আমার স্যুটকেসটা ঘরে পৌঁছিয়ে দিলো। বউদি বললেন, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি ঘরে। এক ঘণ্টায় তৈরী হয়ে নিন, তারপর সকলে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবো।

বেয়ারা থার্মোস-এ করে খাওয়ার জল দিয়ে গেলো। বাথরুমে তোয়ালে সাবান চেক করলো।

আমি বললাম, তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

ও হাসল। বলল, রামখেলাওন। বাড়ি হাজারীবাগের কাছে সীমারীয়ায়।

আমি বললাম, বাড়িতে কে কে আছে?

ও বলল, বাবা নেই; মা, ছোট ভাইরা।

রামখেলাওন জাস্ট একজন বেয়ারা। রূপদা ওকে বেয়ারা বলে ডাকেন। বেয়ারারও যে বাড়ি থাকে, বাড়িতে লোক থাকে এবং একটা নামও থাকে এসব রামখেলাওন নিজেও বুঝি ভুলে গেছিল। কেউ জিগগেসও করে না কোনোদিন ওকে।

মানুষ রামখেলাওন খুব খুশী হল আমার সঙ্গে কথা বলে।

ও চলে গেল।

রামখেলাওন। আসলে রাম।

আমি জানতাম, ওর নামও রাম হবে।

৯

এখানে কয়েকদিন হলো।

আমার একদম ভালো লাগছে না। ভাগ্যিস স্থপা ছিল।

জঙ্গলের পথে সকাল বিকেল একা একা হাঁটি। রাই কমই যায়। হাঁটা ওর অভ্যেস নেই। হাঁটলে গোড়ালি ব্যথা করে। শ্রী প্রথম দিন গেছিল, তারপর থেকে যায় না। ক্লাবে ওর সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী ছেলের আলাপ হয়েছে। সে নাকি জোনাথন ব্ললে এক-পা দিয়েই আছে। এই বয়সেই এত উন্নতি করেছে যে সকলেই জানে, কালে ও কোম্পানীর বোর্ডে চলে যাবেই।

শ্রী ওর সঙ্গে নাচছে ক্লাবে রোজই। গত শনিবার দুপুরে লাঞ্চে ও খেতে গেছিল ছেলেটির একা-বাড়িতে।

রাইকে দেখেও এখানের অনেক এলিজিবল্ ব্যাচেলররা ইন্টারেস্টেড। অনেকেরই হার্টথ্রব হয়েছে ও। দুজনের সঙ্গে নেচেছিল রাই। বেশ লাগল দেখতে। এখানে এসে রাই-এর প্রকৃতির অন্য একটা দিক হঠাৎ আবিষ্কার করলাম। এই আবিষ্কারের জন্যে তৈরী ছিলাম না মনে মনে।

আমি নাচতে পারি না। মুখে গরম আলু পড়লে অবশ্য নাচি, বাধ্য হয়ে। তাছাড়া, কেন জানি, দিশী ছেলেমেয়েদের ইংরিজী

গানের সঙ্গে ইংরিজী নাচ আমার চোখে কেমন বিজাতীয় ঠেকে। হয়ত আমি ব্যাক-ডেটেড। হয়ত আনস্মার্ট। রাই খুশী হতো আমিও নাচতে পারলে। ওরা কোথায় যে এসব নাচানাচি শিখল তা ওরাই জানে। শ্রী ত তাও লরেটোতে পড়েছে, কিন্তু রাই? সেও ত নাচে কম যায় না!

রাই-এর পীড়াপীড়িতে এবং সুপার মৌন সম্মতি থাকাতে আমি রূপদার স্ত্রীকে নাম ধরেই ডাকছি। এবং তুমি বলে। এখানে এসে জানলাম যে, রাই আর সুপা একই বয়সী, ওরা একই বছরে পাশ করেছে, একই উ্যানিভার্সিটি থেকে, সুপাদের বাড়ি হাজারীবাগে। পাটনাতে ছোটবেলায় পড়াশুনা করে তারপর শুধু উ্যানিভার্সিটি স্টেজে কোলকাতায় মামাবাড়িতে থেকে পড়ে ও। হাজারীবাগ সেশানস্ কোর্টে সাধারণ কাজ করতেন ওর বাবা। ওখানেই রিটায়ার করেন। তারপর হাজারীবাগেই ছোট্ট দু কামরার বাড়ি তৈরী করে সেটল্ করেন।

এখানের সবই চমৎকার। তবুও গৃহকর্তার রুক্ষ, গর্বিত অস্তিত্ব আমাকে স্বচ্ছন্দ হতে দিচ্ছিল না। ভদ্রলোককে কেন যেন প্রথম দর্শন থেকেই পছন্দ হয়নি আমার। তারপর থেকে যতই দেখছি, ততই বিরক্তি বাড়ছে। রূপ মুখার্জীর সঙ্গে তার স্ত্রী সুপার কোনোরকম মিলই নেই। আসলে সুপা যে কী করে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘর করে আমার তা ভাবতেই অবাক লাগছে। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে। ছেলেমেয়ে হয়নি ওদের।

রাই-এর দাদা রূপ-এর কাছে জীবনের একমাত্র গন্তব্য জোনাথন ব্লক, যেন-তেন-প্রকারেণ। জোনাথন ব্লক-এ যে ক্লাব আছে তাতে রোজমেরী ব্লকের বড়সাহেবদেরও প্রবেশ নিষেধ। এবং ঠিক সিয়েরা

ব্লকের বড় সাহেবদেরও রোজমেরী ব্লকের ক্লাবের চত্বরে যাওয়া মানা।

হাজার হাজার একই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রায় একইরকম বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন একই শুভাশুভ বোধ, একই সুখ-দুঃখের ভাগীদার মানুষকে মাইনে ও পদমর্যাদার বেড়া দিয়ে আলাদা করা হয়েছে এখানে। এইটেই আশ্চর্য লাগছে যে, এই মানুষগুলো যার যার বেড়ার মধ্যে পায়ে দড়ি-বাঁধা জানোয়ারের মত ঘাস ও রুজী খুঁটে খাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে। এবং বেঁচে আছে এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে যে, কে কখন অন্যের মাথায় খুরের চাট মেরে তার ঘাড় টপকে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে পাহাড়তলীর আরও একটু উঁচু জমির অন্য বেড়া-ঘেরা চত্বরে গিয়ে পড়বে; কখন পড়বে, কী করে পড়বে।

সুপা কোনদিনও ক্লাবে যায়নি। রোজই বলেছে যে, অতিথি এসেছে বাড়িতে, খাওয়া দাওয়া না দেখলে কী করে হবে? আমি ত আছিই, থাকিই এখানে; তোমরা যাও।

বাংলোতে বাবুর্চি আছে। বিহারী মুসলমান। গভর্নরের বাবুর্চি ছিল ওর বাবা। ইংরিজী রান্না দারুণ জানে। কিন্তু দিশী রান্না ভালো জানে না। দই-মাছ, শাক-কড়াইশুঁটি, পটলপোস্ত, কড়াইশুঁটির কচুরী, এই সব সুপা নিজে হাতে করত। শুধু রান্নাই যে করত তাই-ই নয়, এমন করে সামনে বসে খাওয়াত যে তা বলার নয়। ওর বয়সী কোনো আধুনিক মেয়েকে আমি এমন দেখিনি।

সেদিন সুপাকে বললাম, তুমি না গেলে আমিও যাবো না ক্লাবে। আজ নবমীর দিন। বাবুর্চিখানায় তোমাকে থাকতে দেবো না।

তখন বারান্দায় কেউই ছিলো না। রূপদা অফিসে। শ্রী ও রাই কাল অনেক রাত অবধি যাত্রা দেখেছে পূজা-মণ্ডপে। দুপুরে

খেয়ে ঘুম লাগিয়েছিলো ওরা। আমি আর সুপা বারান্দায় বসে বিকেলের চা খাচ্ছিলাম।

আমার কথা শুনে সুপা বলল, ঈসস্, আমাকে এমন করে আমার বর যদি কখনও বলত!

আমি চমকে উঠলাম। বললাম, যার অনেক গুণ থাকে তার কিছু কিছু দোষও থাকে। আমার সঙ্গে তোমার বরের তুলনা করে হাসিও না। কোথায় আমি আর কোথায় রূপদা?

সুপা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। উজ্জ্বল সোনালী সর্ষের তেলের মত গায়ের রঙ ওর। কাটা কাটা মুখ চোখ, সুন্দর মাথাভরা টান টান চুল, থুতনিতে তিল! সে-কারণে ভারী সুন্দর দেখায়।

ও বলল, একজন পুরুষের কাছে একজন মেয়ে কী সবচেয়ে বেশি করে চায় জানো? বলতে পারো?

আমি বললাম, আমি কী করে জানব। তুমিই বলো।

ও বলল, বিয়ে করতে যাচ্ছো, তোমার জানা দরকার, মানে আবিষ্কার করা দরকার। একথা কেউ কাউকে বলে দেয় না, বলা সম্ভবও নয়; কারণ প্রত্যেক মেয়ে প্রত্যেক পুরুষই আলাদা। তুমি রাইকে এখানে কাছ থেকে জানবার সুযোগ পাচ্ছো, এমন এক সঙ্গে, এত কাছাকাছি ত থাকোনি আগে। চোখ খুলে সমস্ত মন দিয়ে ওকে বোঝার চেষ্টা কোরো—নইলে তোমাদের সুখ হবে না। সুখ কেউই কাউকে দিতে পারে না। বিবাহিত জীবনের সুখ দুজনে মিলে গড়ে নিতে হয় নিজের নিজের অনেকখানিকে অন্যের কাছে বাঁধা দিয়ে।

আমি বললাম, তুমি ত অনেক জানো, অনেক জেনেছো। তুমি

কী সুখী হয়েছো সুপা ?

সুপা আমার চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর, চোখ নামিয়ে নিল।

বলল, তোমার জেনে লাভ কি ? যদি আমি সুখী না হয়ে থাকি তাহলেও আমার সমস্যার সমাধান কী তোমার হাতে আছে ?

আমি চমকে উঠলাম।

সুপা আবার বলল, তুমি বড় ছেলেমানুষ। একজন অনাত্মীয়া মেয়েকে কেউ এমন করে এমন মারাত্মক প্রশ্ন করে ?

তারপর একটু পরে বলল, রাইয়ের দাদা আর আমি—মানে, আমরা দুজন, বিলঙ টু টু ওয়াইডলী ডিফারেন্ট ক্লাসেস। আমাদের ক্লাসই আলাদা। জোনাথন ব্লকের সঙ্গে দয়াময়ী ব্লকের কি কখনও বিয়ে হতে পারে ? বিয়ে হলেও সুখ কি তারা পায় ?

এমন সময় একটা লাল-রঙা ইম্পোর্টেড ভোকস্‌ওয়াগন গাড়ি এসে ঢুকল গেটের মধ্যে। গাড়ির দু-দিকের দরজা খুলে দুটি ছেলে নামল। একজন আমার সমবয়সী, অন্যজন শ্রীর ডান্সিং পার্টনার কিংকি মালহোত্রা।

ওরা বলল, হাই।

আমি ও সুপা উঠে দাঁড়ালাম।

মালহোত্রার সঙ্গের লোকটিকে দেখে সুপা একটু অবাক এবং সন্ত্রস্ত হল ; সসম্মানে বলল, ওহ ! হোয়াট আ সারপ্রাইজ মিঃ ধাওয়ান। হোয়েন ডিড উ্য কাম ব্যাক ?

মিঃ ধাওয়ান বললেন, লাস্ট ইভনিং।

সুপা বলল, রূপ ইজনট হোম।

উই নো। ধাওয়ান বলল।

কিংকি বলল, উই ড্রপড ইন এ্যাট দ্য অফিস অন দ্য ওয়ে। হি ইজ ইন দ্য মিডস্ট অফ আ কনফারেন্স। হি উইল বী হোম ইন নো টাইম।

ওদের নিয়ে সুপা বসবার ঘরে গেল। আমি আবার বসে পড়লাম। আমি ছুটি কাটাতে এসেছি; জাস্ট রিল্যাকস্ করতে—আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই ওদের প্রতি। বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে অলরেডী পলিউটেড লাইফকে আরও বেশি পলিউটেড করার ইচ্ছা নেই আমার।

আমি বসে বসে আফ্রিকান মীথোলজীর উপর লারুসের সিরিজের একটি বই পড়ছিলাম। ছোট্টবেলায় বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় পড়ার পর থেকেই আফ্রিকা আমাকে হাতছানি দেয়। সময় পেলেই পড়াশুনা করি। তারপর বড় হয়ে পড়েছি হেমিংওয়ে এবং আরো নানা লোকের লেখা বই। মিশরের উপর অনেক বই। সেরেঙ্গেটি, কিলিম্যানজারো, গুরু—গুরু ক্রাটরা জন্তু জানোয়ার, ভূত প্রেত, ভারতবর্ষের সঙ্গে এই মহাদেশের অনেক দিকের মিল। একবার আফ্রিকায় যাবার বড় শখ আমার।

রাই আর শ্রী এসেছে মনে হল ড্রইংরুমে। ওদের সবে ঘুম-ভাঙা উঃ আঃ লাস্যময় তুখোড় উচ্চারণের সেকসএ্যাপীলিং ইংরিজী শুনতে পাচ্ছি। বাইরে শালগাছের উপর দিয়ে টিয়ার দল ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। কারখানায় ভোঁ বাজল—পাঁচটার।

শীতের বেলা পড়ে গেল। ভাঙিল সুখমেলা।

সুপা এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

আমি বললাম, ধাওয়ান কে?

সুপার মুখটা কালো দেখালো। বলল, ধাওয়ান জোনাথন

ব্লকে থাকে। রাইয়ের দাদার ইমিডিয়েট বস। কোনোদিনও আসেনি এ বাড়িতে। হঠাৎ? আজ?

তারপরই আমার কাছে এসে নীচু গলায় বলল, জানো, আমার মন ভাল লাগছে না। ওদের কথাবার্তা দেখে মনে হচ্ছে যাত্রা দেখতে গিয়ে কাল রাইয়েব সঙ্গে আলাপ হয়েছে ধাওয়ানের। বাই-এর জন্যেই এসেছে, কারণ শ্রীব প্রতি ইণ্টাবেস্টেড কিংকি মালহোত্রা।

আমি হাসলাম। বললাম, মন খারাপের কি আছে? তোমার ননদিনী যে মোহিনী এই জানাতে ত তোমাব গর্ব হওয়াই উচিত।

তা নয়। ধাওয়ান লোকটা সুবিধের নয়। যদিও এখানে মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর ও। মাস তিনেকেব মধ্যে ডিরেকটর হয়ে যাবে কোম্পানীর। যে-কোনো মেয়েই ওকে বিয়ে করতে চায়—। কিন্তু লোকটা পাজী।

পাজী মানে?

মানে, মেয়েদের ব্যাপারে পাজী।

আমি ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্যে বললাম, ওর মত এলিজিবল ব্যাচেলর হলে আমিও হয়ত একটু পাজী হতাম। অন্যেরা পেজোমি করতে দিলেই না কেউ পাজী হতে পারে। এক হাতে ত তালি বাজে না। পুরুষদেরই বুঝি দোষ সব?

সুপা বলল, তুমি বুঝছো না ব্যাপারটা। হি ইজ আ ভেরী স্মুথ টকার। দেখতেও হ্যাণ্ডসাম। একজন মেয়ে উপরে উপরে যা চাইতে পারে তার সবই দেওয়ার ক্ষমতা আছে ওর। কিন্তু ও নোটোরিয়াস প্লে-বয়। সুন্দরী মেয়ে পেলেই হল। বিয়ে-টিয়ের দিকে ও যাবেই না।

আমি বললাম, তাহলে ত আমি সেফ।

তুমি যাও না ড্রইংরুমে। রাইকে ওর কাছে একা ছেড়ে দেওয়া তোমার ঠিক হচ্ছে না।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, রাই কি হরিণশিশু আর ও কি বাঘ! তোমার ননদিনী ত বাচ্চা মেয়ে নয়, তার যদি কারো সঙ্গে কথা বলেই বিপজ্জনকভাবে তাকে ভালো লেগে যায়, ত বুঝতে হবে আমার প্রতি ভালো লাগাটা তার যথেষ্ট খাঁটি এবং গভীর নয়।

স্থপা বলল, ঋদ্ধি! তুমি বড় অবুঝ ছেলেমানুষ। তুমি আমার কথা শোনো, যাও। জরু গরু শক্ত হাতে সামলে রাখতে হয়। জানো না?

এমন সময় রূপদা ফিরলেন অফিস থেকে। দৌড়তে দৌড়তে সিঁড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতে উঠতে বললেন, এসে গেছে? কতক্ষণ? কি খাওয়াচ্ছ? হুইস্কী দিয়েছো?

রূপদার এই অবস্থা দেখে আমার ওয়েটিং ফর গোদোর কথা মনে হল। সত্যিই ত! রূপদার কাছে ধাওয়ানই ভগবান।

স্থপা ঠাণ্ডা বিরক্তির গলায় বলল, এখনও ত আকাশে সূর্য আছে। হুইস্কী? সান ডাউনের আগেই?

রূপদা উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না, দৌড়ে ড্রইংরুমে ঢুকে গেলেন।

এমন সময় রাই বারান্দায় এলো, আমাকে চাপা ধমক দিয়ে বলল, তুমি কীরকম? একবার এসো। মিঃ ধাওয়ান দাদার বস। একেবারেই ম্যানার্স জানো না তুমি।

আমি বই বন্ধ করে বললাম, আমি ত উনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই মীট এবং গ্রীট করেছি। তোমরা ত গল্প করছোই। আমার সঙ্গে গল্প করতে ত আর ওঁরা আসেননি।

আমার কথার খোঁচাটাকে ভ্রূক্ষেপ না করে রাই বলল, না, তা আসেননি। তাহলেও তোমার একবার যাওয়া উচিত। ওঁদের বাড়িতে কাল আমাদের ডিনারে ডাকছেন। আমাদের অনারে আরো কয়েকজনকে। তোমাকে ফর্ম্যালী বলতে চান মিঃ ধাওয়ান।

আমি উঠলাম। আলোকোজ্জ্বল ড্রইংরুমে ঢুকতেই ধাওয়ান মোরগ লড়াই-এর ঘাড়ের লোম ফুলোনো লাল মোরগের মত আমার দিকে তাকালো—প্রতিপক্ষকে সাইজ আপ করার দৃষ্টিতে।

আমি ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ প্রেমময় চোখে ওর দিকে তাকালাম। আমার ভাষায় ছিল যে, ধাওয়ান তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রতিযোগিতা নেই।

ধাওয়ান বলল, ইউ মাস্ট কাম মিঃ মজুমদার। ইটস বীইং এরেঞ্জড অল ফর ইওর অনার।

আমি বললাম, আই অ্যাম ইলেটেড। বাট আই অ্যাম রানিং আ টেম্পারেচার। ইফ আই ফিল ওকে টু-মরো, আই শ্যাল সার্টেনলি মেক ইট। থ্যাঙ্ক উ্য ভেরী মাচ ইনডিড।

বলেই, আমি চলে এলাম ওদের কাছে বিদায় নিয়ে। রূপ মুখার্জীর অবস্থা দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। ধাওয়ানকে কি করে খুশী করবে, কি খাওয়াবে, কোথায় বসাবে ভেবে পাচ্ছিল না। রাই এবং শ্রী এখানে প্রথমবার এসেই যে তাঁর জীবনে এত বড় একটা সুখবহ ঘটনা ঘটাবে তা রূপদার কল্পনারও বাইরে ছিল। এত আনন্দ ও উত্তেজনা রূপদা কোথায় যে রাখবেন!

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছিল। প্যাঁক প্যাঁক করে সাইকেল রিকসা যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে গাড়ি: হুসস হুসস করে হেডলাইট জ্বেলে। দুটো একটা।

ড্রইংরুমে হাসি আর কথার তুবড়ি ছুটছে। ওরা তন্ময়। আমার কথা ভুলেই গেছে। আমার অস্তিত্বও। রাই পর্যন্ত।

একটা অলিভ গ্রীন রঙা প্যান্ট ও ঐ রঙের হাফ-হাতা সোয়েটার পরে টর্চটা হাতে নিয়ে আমি হেঁটে আসতে গেলাম বাইরে। হাঁটতে-হাঁটতে কারখানার দিকে অনেক দূরে চলে গেলাম। চওড়া রাস্তার দু ধারে বড় বড় কৃষ্ণচূড়া ও অন্যান্য কেসিয়াভ্যারাইটির গাছ। কোলকাতায় কোনো রাস্তায় আর হাঁটা যায় না। কই মাছের মত মানুষ খলখল করে আওয়াজ, ধুঁয়ো, জল, গাড়ি—বাস। এখানে কী শান্তি! হাঁটতে ভারী ভালো লাগে।

এক একটা ব্লকের বাড়ি এক একরকম। মানুষ জন, তাদের পোশাক-আশাক গলার স্বর, আদব-কায়দা সব আলাদা আলাদা। একটা কারখানাতে কতরকম কত জোর-করে বানানো শ্রেণী।

খাকী প্যান্ট আর শার্ট পরে একজন বুড়ো লোক কারখানার একেবারে গেটের কাছ থেকে হেঁটে আসছিল। দারোয়ান কী গার্ড হবে বোধহয়। পথের আলোর নীচে আমার সঙ্গে মুখোমুখি হতেই লোকটা থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই আমাকে স্যালুট করল মিলিটারী কায়দায়।

আমিও ক্যাবলার মত স্যালুট করলাম। ভাবলাম, জোনাথন ব্লক বা রোজমেরী ব্লকের লোকেরা বোধহয় এই সম্মান পেয়ে থাকেন।

লোকটি বলল, মেরী কসুর মাপ কিজিয়েগা সাব্, আপকি শুভ নাম?

আমি অবাক হয়ে নাম বললাম।

লোকটি বলল, আপকা পিতাজী ক্যা ফৌজমে থেঁ? উনকা শুভ নাম?

আমি আঁরও অবাক হয়ে বললাম, বহুত সাল পয়লে। প্লেন ক্র্যাশমে উনোনে···

আর বলতে হলো না। লোকটির দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমার একেবারে কাছে এগিয়ে এসে বলল, উস ওয়াক্ত আপকি উমর কিতনা থা সাহাব?

আমি বললাম, ঢাই সাল।

লোকটি আমার দু হাত চেপে ধরল প্রথমে। তারপর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

ঠিক সেই সময় একটা গাড়ির হেডলাইট এসে পড়ল আমাদের উপরে। জোরে আসছিল গাড়িটা। গাড়িটা সামনে এসেই ব্রেক করে থেমে গেল। দেখলাম, সেই লাল ভোকসওয়াগনটা।

কিংকি মালহোত্রা এক লাফে নেমে দৌড়ে এল। বলল, এনি ট্রাবল মিঃ মজুমদার?

মালহোত্রার পিছনে পিছনে রূপদাও নেমে এলেন।

লোকটা ওদের গাড়ি দেখে সঙ্গে সঙ্গে এ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল ওদের।

আমি মালহোত্রাকে বললাম, নো ট্রাবল। উই আর ওল্ড প্যালস। ইট এ্যাপীয়ারস টু বী আ হ্যাপী রি-ইউনিয়ন।

গাড়ির পিছন থেকে রাই আর শ্রীর গলাও পেলাম। শ্রী বলল, এই ঋদ্ধিদা উঠে এসো—উ্য আর ওয়েলকাম। আমরা জঙ্গলের মধ্যে লং-ড্রাইভে যাচ্ছি। হরিণ দেখব।

রূপদা বললেন, সঙ্গে এনাফ হুইস্কী আছে, মেয়েদের জন্যে জিন কোল্ড বিফ হ্যাম। ওখানে ফুলটং বলে একটা পাহাড়ের মাথায় একটা ফরেস্ট বাংলো আছে—তার চওড়া বারান্দা থেকে ইজী

চেয়ারে বসে যা ভিউ না—যাবে নাকি ঋদ্ধি? গাড়ি অবশ্য প্যাকড্।

আমি বললাম, সুপা? একা আছে বাড়িতে?

ও একাই থাকে। কুনো ছ্য গ্রেট। তুমি যাবে ত বলো।

আমি বললাম, গাড়িতে ত আঁটবে না। আপনারাই ঘুরে আসুন।

আচ্ছা। বলে রূপদা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। কিংকি গাড়িতে উঠলো। ধাওয়ান গাড়ি থেকে নামেই নি। রাই ও শ্রীর সঙ্গে পিছনে বসেছে ও। দুজনের মধ্যে।

শ্রী চেঁচিয়ে বলল, কি হলো?

রাই কিছুই বলল না।

আমি হাসলাম। বললাম, হ্যাভ আ নাইস টাইম।

রূপদা বলল, আমাদের দেরী হলে তোমরা খেয়ে নিও। ডোণ্ট ওয়ারী।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

রাই ও শ্রী টা-টা করল আমাকে। গাড়িটা আবার ধ্বক ধ্বক করে এগিয়ে গেল। ভোকসওয়াগন গাড়িগুলোর এঞ্জিন পেছনে থাকে।

অনেকের মনের এঞ্জিনের মত।

গাড়িটা চলে গেলে এ্যাটেনশান পজিশন থেকে এট-ইজ পজিশনে এসে লোকটি বলল যে, ও আমার বাবার অরডারলি ছিল। বাবা প্লেন ক্র্যাশে মারা যাওয়ার দিনও ও বাবার জামা-কাপড় গুছিয়ে দিয়েছে। মা ওকে খুব ভাল করে চিনতেন। এখন আমার মনে পড়ল, মায়ের কাছে ওর গল্পও শুনেছি অনেক। রামবাহাদুর ওর নাম। আসলে রাম।

আমি জানতাম, ওর নামও রাম হবে। আর্মি থেকে রিটায়ার করার পর ও এখানে সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে জয়েন করেছে।

আমি বললাম, চলো চলো, তোমার বাড়ি নিয়ে চলো আমাকে রাম।

ও বলল, এমনি করে নয়, তুমি কোথায় উঠেছো বলো। আমি গিয়ে তোমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসব। দশেরার দিন। মানে কালকে। আমার ওখানে খাবে তুমি। রাতে।

আমি অভিভূত হয়ে গেছিলাম। বললাম, আমাকে তুমি চিনলে কি করে?

বাবার মৃত্যুর সময় আমি ত আড়াই বছরের ছিলাম।

রাম বলল, সেইভাবে চিনিনি, তুমি অলিভ গ্রীন রঙের পোশাকে হেঁটে আসছিলে, আমি হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিলাম। ভাবলাম, পঁচিশ বছর পরে আমার মেজর সাব কোথা থেকে ফিরে এলেন!

তারপর আমার হাতে হাত রেখে রামবাহাদুর বলল, একেবারে এক চেহারা। এমন কি হাঁটার ভঙ্গীটাও একরকম। এত মিল; ভাবা যায় না।

আমি বললাম, 'বাপ কা বেটা, সিপাহীকো ঘোড়া : কুছ নেহী ত থোড়া থোড়া।'

ও হাসল। বলল, সাহী বাত।

তারপর বলল, খোকাবাবু আমরা ফৌজী লোক। ফৌজী লোকদের চাল আলাদা, শ্রেণী আলাদা, ওখানে জেনারেল সাহাব ভি জওয়ানের খোঁজ রাখেন। মওতের মধ্যেই আমাদের জিন্দগী। এই সব কারখানা-ফারখানার অফিসারদের মত কামীনা নয় ফৌজী

অফসররা। ওখানে প্রেম আছে। ছোট বড়কে মানে বটে, উঠতে বসতে স্যালুট ঠোকে ঠিকই, কিন্তু বড়ও মনে মনে ঈর্ষা করে ছোটকে। এখানের মত নয়।

যখন ফিরলাম তখন দেখি বারান্দা অন্ধকার। শুধু বাবুর্চীখানায় একটা বাতি জ্বলছে। নুড়ি-ঢালা পথে হেঁটে এসে যখন বারান্দায় উঠেছি তখন অন্ধকার থেকে সুপা বলে উঠল, ফিরলে?

আমি বেতের চেয়ার টেনে ওর পাশে বসলাম। বললাম, তুমি গেলে না?

ও উত্তর না দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করল, আর তুমি?

আমি চুপ করে থাকলাম।

সুপা হঠাৎ বলল, আজ শেষ পুজোর দিন, সকাল থেকে একবারও প্রতিমা দেখলাম না। আমাকে নিয়ে যাবে?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই।

সুপা বলল, আমি চান করে, শাড়িটা পালটে আসছি। পাঁচ মিনিট বোসো।

বাংলোর পিছন থেকে ঢাকের শব্দ আসছিল। পিছনে প্রকাণ্ড মাঠ। এখানে সব ব্লক মিলিয়ে বারোয়ারী পুজো হয়। জোনাথন, রোজমেরী, সিয়েরা ইত্যাদি ব্লকের বাসিন্দারা গাড়ি করে কখনও এসে প্রতিমাকে ধন্য করে যান। ওখানে ভীড় করেন অন্যান্য ব্লকের বাসিন্দারা। সাহেবরা পুজো-ফুজোর দিন বোরড হয়ে যাবার ভয়ে ক্লাবে কাটান, বাড়িতে বীয়ার পার্টি করেন, মণ্ডপে যান না। রাতে যাত্রা ইত্যাদি ফাংশন হলে সারি সারি চেয়ার পাতা হয়। ব্লক হিসাবে বসবার বন্দোবস্ত। পুজো-মণ্ডপেও বড় অফিসাররা এবং তাঁদের পরিবারের লোকেরা সামনের সারিগুলোতে বসেন,

যদি আসেন। কাল রাই এবং খাওয়ান নিশ্চয়ই সামনের সারিতে বসে যাত্রা দেখেছে শ্রী, কিংকি এবং রূপদার সঙ্গে।

একটু পর সুপা এলো। একটা নতুন শাড়ি পরেছে, গাও ধুয়েছে। কিন্তু কপালে টিপ পরেনি। পারফ্যুমের হাল্কা গন্ধ। লম্বা চুলটা খোঁপা করে বেঁধেছে। এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ওকে ওর শাড়ির মতো ঘিরে ছিল।

আমি বললাম, পুজোর দিনে অন্ধকার বারান্দায় বসেছিলে কেন একা? গেলে না কেন ওদের সঙ্গে?

সুপা উত্তর না দিয়ে বলল, চল।

বড় বড় সেগুন গাছ এদিকে। নীচে নীচে আলো ছায়ার জাফরী-কাটা পায়ে-চলা পথ। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা, পুটুসের ঝোপ-ঝাড়, খোয়াই; একটা নদী বয়ে গেছে—সামান্য জল চলছে তিরতির করে। এদিকে ওদিকে খোলা টাঁড় দূরের জঙ্গলে আর পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। ডিড উ্য ডু ইট, পাখি ডাকছে দূরের অন্ধকার দিগন্তে ঘুরে ঘুরে। কে কি করেছে কে জানে? কার কাছে যে জবাবদিহি চায় পাখিগুলো তা ওরাই জানে।

সুপা আমার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছিল। ওর সবে চান করে ওঠা শরীরের সাবানের গন্ধ, পারফ্যুমের গন্ধ, নতুন তাঁতের শাড়ির মিষ্টি গন্ধ আর এই খোলা বিহারী প্রকৃতির শরত-রাতের গন্ধ মিলেমিশে গেছিল। আমার খুব ভাল লাগছিল। রাই এমন হঠাৎ ওর বাইরের খোলসটা বা মুখোশটা বদলে ফেলায় বুকের মধ্যে যে নিদারুণ একটা কষ্ট বোধ করছিলাম দুপুর থেকে, সেই কষ্টের সমস্তটুকু মুছে নিল সুপার সান্নিধ্যর সুখ। রাই যে এত জিন খায়, আমি জানতাম না। এমন কি শ্রীও খায়। অতটুকু মেয়ে?

নবমীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। সেগুন পাতায় পিছলে যাচ্ছে নির্মেঘ সুনীল আকাশ থেকে নেমে আসা সেই চাঁদের আলো।

সুপা প্রতিমার একেবারে সামনে চলে গেল। আমি ডানপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন আরতি হচ্ছিল, সুপা করজোড়ে প্রণাম করল প্রতিমাকে। আরতির ঢাকের ও কাঁসরের শব্দে, ধুনোর গন্ধে, বাচ্চাদের গলার চিকন চিৎকারের মধ্যে সুপা যখন ঠাকুর প্রণাম করছিল তখন ওকে বড় কাছের, খুব আপন বলে মনে হচ্ছিল আমার।

আমি বললাম মনে মনে, সুপা! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কোথায় হারিয়ে গেছিলে তুমি। এই বিস্তৃত পৃথিবীতে কাছের লোকেরা যে কত দূরে, ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে! কারো কারো সঙ্গে কোনো দৈব দুর্ঘটনায় দেখা হয়ে যায়, কারো সঙ্গে বা দেখাই হয় না কখনও। তোমার সঙ্গে দেখা হলো যদি ত আগে হলো না কেন?

প্রতিমার সামনে দাঁড়ানো সুপাকে পাশ থেকে অনেকটা আমার ছোটবেলার মায়ের মত দেখাচ্ছিল। সুপা আমার ক্লাসের মানুষ, রাই নয়। রাই যে নয়, তা রাই আর শ্রী মালহোত্রা আর ধাওয়ানকে নিয়ে যা করছে তাতেই প্রমাণিত হয়। আমাকে এখানে এনে এমনভাবে অপমান নাও করতে পারত রাই। ভালোবাসা ও-ই আমাকে প্রথমে জানিয়েছিল, আমি অগ্রণী হয়ে যাইনি ওর মনের কাছে। শরীরের কাছে ত নয়ই।

আসলে, আজ বুঝতে পারছি, রাইও আমাদের দেশের রাজনীতিকদের মত নিজের স্বার্থে, নিজের উন্নতির কারণে যখন-তখন দল-বদল করে, শ্রেণী বদল করে। ওয়েস্টার্ন ছবির হিরোরা তাদের

ঘোড়ার গায়ে গুলি লেগে গেলেই বিশ্বস্ত বাহনকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে দু হাতে পিস্তল নিয়ে ব্যাং ব্যাং করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আরো তেজী এবং জীবন্ত অন্য কোনো ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে ওঠে। যাদের জীবনে জাগতিক উন্নতি এবং দৌড়ে যাওয়াটাই একমাত্র উদ্দেশ্য, সে দৌড়ের কোনো গন্তব্য থাক আর নাই-ই থাক ; তাদের মৃত ঘোড়ার বা শ্লথ ঘোড়ার জন্যে শোক করলে চলে না। রাই আমাকে কিছুদিনের জন্যে তার বাহন করেছিল ; আমাকে ভালো-বাসেনি। যে মুহূর্তে আমার চেয়ে ভালো ঘোড়ার খোঁজ পেয়েছে তখুনি বিনা দ্বিধায় আমাকে ফেলে দিতে ওর একবারও বিবেকে বাধেনি।

আমি ভাবছিলাম, পাঞ্জাবী ছোঁড়া দুটো কি ভাবল। বাঙালী মেয়েরা তু-তু করলেই দৌড়ে যায়। ভালো খাওয়া, ভালো থাকা, ভালো বাংলো, ভালো বাবুর্চি, এইই সব। জীবনে চাওয়ার আর কি কিছুই নেই ? ছিঃ ছিঃ, বড় লজ্জার।

আমরা ফিরে আসছিলাম। অন্ধকারে একটা নীচু জায়গাতে হঠাৎ পাথরে হোঁচট খেয়ে সুপা পড়ে যাচ্ছিল। আমি ওকে না ধরলে পড়েই যেত। ওকে ধরতে যেতেই ও হুমড়ি খেয়ে আমার বুকে এসে পড়ল। একমুহূর্ত থেমে থাকল ওর শরীরটা আমার বুকে। আমি ডান হাতে ওর বাঁ হাত ধরেছিলাম। সামলে নিল ও পরক্ষণে। আমি হাত ছেড়ে দিলাম।

ও একবার আমার দিকে তাকাল। তারপর ও নিজেই ওর বাঁ হাতটা দিয়ে আমার ডান হাতটা ধরল। বলল, তোমার হাতটা এত নরম কেন ? মেয়েদের মত।

আমি হাসলাম। বললাম, কি জানি ? হয়ত মনটাও আমার

নরম বলে!

ও বলল, মেয়ে বা ছেলে কারোই বেশি নরম হওয়া ভালো না। নরম হলে বড় কষ্ট সইতে হয়।

আমি ওর হাতে চাপ দিলাম আমার হাত দিয়ে। বললাম, জানি। তারপর বললাম, তোমাকে একটা ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করব? রাগ করবে না?

সুপা বলল, আমাকে দেখে কি মনে হয় রাগ করব? রাগ যে আমি করতে জানি না। রাগ করতে পারলে কি আমার এই দশা হয়?

আমি বললাম, তোমরা বাচ্চা চাও না? তোমাদের বাচ্চা নেই কেন?

সুপা আমার দিকে তাকাল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, যা চাওয়া যায় তার সবটাই ত নিজের আয়ত্তের মধ্যে নয়।

একটু পরে বলল, আমার দোষ নয়। আমার দোষ নেই কোনো। ডাক্তার বলেছেন, অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে; বলেছেন বেশি মদ খেয়ে ও…

আমি চুপ করে থাকলাম।

তারপর সুপা বলল, তোমাকে সাধে কি ছেলেমানুষ বলি? এই প্রশ্নটাও কি কোনো অনাত্মীয়া মহিলাকে করে?

আমি বললাম, আমি ত অনাত্মীয়া ভেবে করিনি। আত্মীয় কে? যে আত্মার কাছে থাকে সে কি আত্মীয় নয়?

সুপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জানি না।

দেখতে দেখতে আমরা বাংলোর কাছে চলে এলাম।

আমি বললাম, ওরা কি এসে গেছে এতক্ষণে?

পাগল! ওরা যেখানে গেছে সেখানে যেতেই লাগবে দু ঘণ্টা। বিয়ের পর পর এখানে প্রথম এসেই একবার গেছিলাম। বন-জঙ্গলের পথ, গাড়ি খারাপ হলে সারা রাতও থাকতে হতে পারে।

আমি বললাম, ও···।

বারান্দায় এসে আবার আমরা বসলাম পাশাপাশি। বাগানে হাসনুহানা ফুটেছে, গন্ধে ম ম করছে বাগান, চারধার নবমীর আবছা চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে আছে।

সুপা বলল, তুমি কি চা খাবে?

আমি বললাম, তুমি খেলে খাবো।

খাবো। ও অস্ফুটে বলল।

তারপর বলল, তুমি বসো, আমি চা নিয়ে আসি।

আমি বললাম, না। তুমি চলে গেলে খাবো না। কাউকে ডাক দিয়ে বলো, দিয়ে যাবে।

ও উঠতে গেলো, আমি ওর আঁচল চেপে ধরলাম।

ও হেসে উঠল। চাপা হাসি। বলল, ছেলেমানুষী করো না। এক সেকেণ্ড বোসো।

ও ফিরে এল। পিছনে পিছনে ট্রেতে বসিয়ে চায়ের পট নিয়ে এলো রাম। তারপর নামিয়ে রেখে ফিরে গেল।

টিপট থেকে চা-টা ঢালতে ঢালতে হঠাৎ সুপা বলল, জানো, আমার না খুব ভালো লাগছে। অনেকদিন এত ভালো লাগেনি।

তারপরই বলল, রাইকে তুমি খুব ভালোবাসো—না?

আমি বললাম, আজকের আগে অবধি তো তাইই জানতাম। আসলে নিজেকে তেমন করে শুধোইনি। সংশয়ের কারণ ঘটেনি

কোনো এর আগে।

রাই-এর ব্যবহারে তুমি খুব দুঃখ পেয়েছো, না? বেচারা! রাই যে কেন তোমাকে এমন করল। কাল রাতে তোমার ওদের সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। ওদের একা ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি।

সুপা বলল, নিজের চাকরির উন্নতির জন্যে রূপ সব করতে পারে। নিজের বোনকে অন্যের বিছানাতেও ঠেলে পাঠাতে পারে।

আমি বললাম, কাল আমাকে তো ওরা যেতে বলেনি। আমি শুয়ে পড়ার পর রূপদার সঙ্গে ওরা গেছে। তা ছাড়া রাই তো আমার সম্পত্তি নয়। সে কোথায় যাবে, কার সঙ্গে মিশবে তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিবাহিতা স্ত্রী হলেও তবু একটা কথা ছিল। ও তো আমার কেউই নয়। ওকে পাহারা দিয়ে বেড়ালে সেটা কি আমার পক্ষে সম্মানের হতো, না ওর পক্ষেই?

তা ঠিক! সুপা বলল। তারপর বলল, এর মধ্যে রূপের প্ররোচনা আছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

তোমাকে? তুমি কি করেছো?

না! সে তো আমার স্বামী।

ওঃ। আমি বললাম।

সুপা বলল, জানো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক ব্যাপারে খুব মিল। আমরা একই রকম, একই শ্রেণীর মানুষ। আর রাই, রূপ ওরা সব অন্য ধরনের; অন্য জগতের। আমার সঙ্গে কোথায় যেন মেলে না! মিলল না একদিনও।

আমি বললাম, তাতে দুঃখিত হবার কি আছে?

সুপা বলল, আমার তো এখন দুঃখিত হওয়া এবং দুঃখিত হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

—নেই কেন?

আমি গরীবের মেয়ে, চেহারা সুন্দর বলে বড়লোক শ্বশুর-শাশুড়ি জোর করে বিয়ে দিয়ে এনেছিলেন। আমার আর কি গুণ আছে? আমার কি ইকনমিক্ ফ্রিডম আছে? আমি কি স্বাবলম্বী? স্বামী খাওয়াচ্ছে বলেই তো খেয়ে-পরে আছি, নইলে খেতাম কি, কি পরতাম? আমার মত সাধারণ বি-এ পাশ লক্ষ-লক্ষ মেয়ে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় রোজ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ইকনমিক্ ফ্রিডম না থাকলে দাসী হয়েই থাকতে হয়; হবে।

আমি বললাম, এটা ঠিক বললে না। আমিও তো সাধারণ এম-এ। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। জেদ থাকলেই মানুষ বড় হয়; ওপেনিং পায়।

আমি আশ্চর্য হলাম নিজের ভণ্ডামি দেখে। সুপাকে আমি বলতে পারলাম না যে, মুরুব্বী না থাকলে আমারও চাকরী হতো না। কভেনাণ্টেড পোস্টে উন্নতি তো দূরস্থান। কিন্তু যে-উন্নতির গর্বে আমি বেঁকে ছিলাম—এখন দেখছি ধাওয়ান ছেলেটির এই বয়সের উন্নত-অবস্থার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্ভাব্য উন্নতির কোনো তুলনাই হয় না। ধাওয়ান এখনই যেভাবে থাকে, যা মায়না পায়, তা আমি শেষ জীবনে গিয়েও পাবো কি-না সন্দেহ। হঠাৎ মনে হলো, সমস্ত জাগতিক উন্নতিই আপেক্ষিক। সমস্ত প্রাপ্তিই তাই।

আমরা দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে। ভাবনা তো কাউকে দেখানো যায় না।

পথ দিয়ে একদল ছেলে-মেয়ে, কলেজে পড়ে বোধ হয়; 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো, ফুলের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভালো' গাইতে গাইতে চলে গেল। অনেক

দূর চলে যাওয়া পর্যন্ত ওদের গান শোনা যাচ্ছিল।

সুপা বলল, এই বয়সটাই দারুণ, না? যখন জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু কল্পনা করার থাকে, অথচ জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না…

আমি বললাম, সত্যি।

তারপর বললাম, একটা গান শোনাও। সেদিন তুমি চান করতে করতে গান গাইছিলে, আমি ড্রয়িংরুমে বসে শুনেছি। গান জানো না বললে শুনছি না।

সুপা কোনো ন্যাকামি করল না। ও বলল, একটা গান শোনাচ্ছি; আগমনী গান, শিলঙের রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো-মণ্ডপে একটি ছেলে গিয়েছিল। ছোট্টবেলায় শোনা, এখনও দু লাইন মনে আছে। বলেই গাইল, "সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিঠুরা নবমী এল, এ নিশি পোহায়ো না, আমার উমা মা যে যাবে চলে।"

ভারী সুন্দর সুরে-বসা গলা, দরদে ভরপুর। যে গান কথা এবং সুরের সিঁড়ি বেয়ে অন্তরের আঙিনায় অবলীলায় পৌঁছয় তাকেই তো গান বলে। সুপার পাশে বসে, আমার জীবনের একটি বিশেষ পুরোনো আশাভঙ্গতার এবং একটি নতুন আশা-রোপণের সন্ধ্যেতে এক ক্ষমাময় উদার এমন কী আশাবাদী মানসিকতায় আমি নতুন করে ভরে উঠতে লাগলাম। বাইরের গাছের পাতায়, পথে প্রান্তরে দূরের উদ্বেল চাঁদের আলো দ্রুত স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল।

১০

অফিসে বেরোচ্ছিলাম। গেট থেকে বাইরে বেরিয়েই গোলমাল শুনলাম।

রমুকাকার বাড়ির সামনে তিন-চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে। রমুকাকা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে হাত নাড়িয়ে কী যেন বলছেন ওদের, আর ওরা সমানে তর্ক করে যাচ্ছে।

বাড়িটা নতুন রং করেছেন। স্নোসেম্ রং। পুরো বাড়ি রং করতে প্রায় হাজার দশেক টাকা খরচ। হাইকোর্টের জাজ ছিলেন তিনি অন্য রাজ্যে। রিটায়ার করে বঙ্গসংস্কৃতির কাছাকাছি থাকবেন বলে রমুকাকা কলকাতায় জমি কিনে বাড়ি করেছিলেন। বাংলার বায়ু বাংলার জলে শরীর মন স্নিগ্ধ করার জন্যে। একতলা ভাড়া দিয়েছেন। সেই ভাড়া এবং পেন্‌শানের টাকা ; এই-ই রোজগার। তা থেকেই রং করার খরচ জুটিয়েছেন। কুড়ি বছর পরে বাড়ি রং করলেন।

আল্‌কাতরা দিয়ে হালকা গোলাপী রংয়ের দেওয়ালের উপর বড় বড় করে লেখা "স্রেনীহীন সমাজ গড়ে তুলুন।"

আমি গেট খুলে বাইরে বেরোতেই শুনলাম, ছেলে তিনটি বলছে, টেংরী খুলে নেবো। একেবারে চুপচাপ থাকুন। আপনারা শ্রেণীসত্রু।

রমুকাকার গায়ে বুক-খোলা ফতুয়া, পরনে লুঙি ও চটি, বুক-ভর্তি সাদা চুল, মাথাভরা টাক। পাকা বেল খাচ্ছিলেন, বুকের চুলে হলুদ একটু বেল লেগে ছিল।

উনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, শ্রেণীশত্রু ? আমি শ্রেণীশত্রু ? সারা-জীবন কত গরীবের ছেলেকে মানুষ করেছি জানো ছোক্‌রারা ? আমি নিজে কিভাবে লেখাপড়া শিখেছি জানো ?

ছেলেগুলো বলল, জানবার দরকার নেই। আপনি, আপনারা এ পাড়ার সবাই শ্রেণীসত্রু। আপনাদের একদিন খতম্ করে দেবো।

রমুকাকা হঠাৎ দেওয়ালের লেখাটার দিকে ভালো করে তাকালেন; তারপর বললেন, তা কোরো, সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ, যা-কিছু ভালো সবই যখন খতম হয়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে অনেকের চেষ্টায়, তখন না-হয় আমাকেও খতম কোরো। সেটা কিছু বড় কথা নয়। তাব আগে, বানানটা ঠিক করো। আমার বাড়ির দেওয়ালে ভুল বানান আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ বরদাস্ত করব না।

কি ভুল বানান ?

ছেলেগুলো ঘাবড়ে গেল !

শ্রেণী বানান কি ? শ্রেণীহীন সমাজ গড়ছো তোমরা আর শ্রেণী বানানটা পর্যন্ত জানো না ?

কি ? কোথায় ?

বলে, ছেলে তিনটি মাথা চুলকোতে লাগল।

রমুকাকা বললেন, দন্ত্য স নয়, তালিব্য শ। বুঝেছো।

হলুদ গেঞ্জী-পরা সুন্দর মত ছেলেটি বলল, এই নরেশ, শিগগিরি ঠিক করে দে বানান, শ্যামলদা দেখতে পেলে পিঠের ছাল তুলে দেবে, বলবে, পার্টির ইমেজ নষ্ট করেছি। লোকে ভাববে, আমরাও বুঝি অন্য পার্টির ছেলেদের মতই অশিক্ষিত।

তখনকার মত রমুকাকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ওরা মনোযোগ

সহকারে বানান শুধরাতে লাগল।

রমুকাকা আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, এই যে খোকা। দেখেছো? কারবার দেখো। এর চেয়ে মিলিটারি রুল, এমন কী এমার্জেন্সীও ভাল ছিল। অন্তত ডিসিপ্লিন ছিল। তখন কারো সাহস ছিলো না অন্যের বাড়ির নতুন রং-করা দেওয়ালে যা খুশী তাই লেখে। মগের মুলুক পেয়েছে! আমি কি কারো বাপের পয়সায় বাড়ি রং করেছি? না ব্ল্যাকমার্কেট করি আমি? কি অন্যায় দেখো তো!

আর্মিকে সব দিয়ে দাও। নিয়মে আসুক। সরকারী অফিসে, কাচারীতে; ব্যাঙ্কে লোকে কাজ করুক। তা নয়, খালি বুক্নি আর বক্তৃতা! মেজাজ কি?

আরে ভয় আমাকে কে দেখাবি? সব বিপ্লবী এসেছেন! ব্রিটিশের সময় ঢের ঢের বিপ্লবী দেখেছি—অনেক দুঃসাহসী, ন্যায়পরায়ণ আত্ম-ত্যাগী সব মানুষ। ভয় যারা পায়, তাদের কাছে যাও। ভয় পায় না এমন অনেক মানুষ এখনও দেশে আছে, এই পোড়া দেশে!

তারপর একটু চুপ করে থেকে টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, এরা ভেবেছে কি বলো তো? আমার নতুন রং-করা দেওয়ালে আলকাতরার কালো রং লাগালেই কি সমাজ শ্রেণীহীন হয়ে যাবে?

আমি বললাম, চলি, রমুকাকা। অফিসের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

উনি বললেন, যাও যাও। সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই কাজে পৌঁছিও। যে জাতের ডিসিপ্লিন নেই, যে জাত কাজ করে না, সে-জাত জাত নয়। ফ্লাইওভার আর পাতাল রেল বানালেই জাত বড় হয় না, মানুষ যদি না থাকে সে দেশে! এই তিরিশ বছরে হিউম্যান মেটিরিয়ালের যা অবনতি ঘটে গেল এ দেশে, সে ক্ষতি আর

পূরণ হবার নয়। ভাবা যায় না, সত্যিই ভাবা যায় না···'

আমি পা বাড়ালাম। রিটায়ার্ড লোককে বেশি কথা বলতে দেওয়াটা বিপজ্জনক। অফুরন্ত সময় ওঁর হাতে। লেট হয়ে যাবে আমার।

অফিসে গিয়েই দেখি তুলকালাম কাণ্ড। রমেন বলে নতুন ছেলেটি ভুল করে কভেনাণ্টেড অফিসারদের জন্যে নির্দিষ্ট ল্যাভাটরীতে ঢুকে পড়েছিল। তাই নিয়ে তার চাকরী যাবার উপক্রম। ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখোমুখী পড়ে গেছিল।

বড়বাবু বললেন, তোমার আগের সরকারী অফিসেও কি দেখোনি? বাথরুম ফর গেজেটেড অফিসরস ওনলী? তুমি এমন বোকামী করলে, চাকরীতে ঢুকতে না ঢুকতেই?

রমেন ছেলেটি এমনিতে চুপচাপ, ঠাণ্ডা; কিন্তু হঠাৎ বড়বাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা ত হিসিই করি ল্যাভাটরীতে, আর ওঁদের কি ওডিকোলোন বেরোয়, সুগন্ধি?

বড়বাবু ধমকে বললেন, চুপ করো, চুপ করো। হ্যাঁ। হয়ত তাইই বেরোয়। আমি কী আর দেখতে গেছি। ভগবানদের ব্যাপারই আলাদা।

অফিস ছুটি হওয়ার পনেরো মিনিট আগে ইনটার্‌কমে এম-ডির অপারেটর মিস্‌ বিয়ান্দকার নাঁকি নাঁকি আদুরে স্বরে বললেন, মিঃ মজুমদার, এম-ডি ওয়াণ্টস্‌ টু সী ইউ রাইট নাউ।

ডুমিয়া থেকে ফিরে আসার পর আমার উন্নতি সম্বন্ধে সমস্ত আগ্রহই চলে গেছে। মায়ের শরীরটা একেবারেই ভালো যাচ্ছিল না। মা বড়মামা-মামীমার সঙ্গে কালই বেনারস চলে গেছেন। বড়মামা এক স্টিভেডর বন্ধুর বাড়িতে উঠবেন। বড়মামার শরীরও

ভালো নেই। মাসখানেকের জন্যে গেছেন।

আমার কোনো অসুবিধা হবে না। বাড়িতে আমার বউ, রাম আছে। প্রত্যেকেই ভালো কি মন্দ স্ত্রীর সঙ্গে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং কিছুদিন পর তাকে ছাড়া আর চলে না। আমার কাছে রামের ব্যাপারটাও তাই। আমার প্রতি ওর যা আন্তরিকতা তা আমার ভবিষ্যৎ-এর বিবাহিত স্ত্রীর মধ্যেও পাবো কি-না সন্দেহ।

এম-ডির ঘরটা বিরাট। ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট। ঘরের বাইরে সেক্রেটারীদের ঘর। তাদের ঘর পেরিয়ে ঢুকতে হয়।

সেক্রেটারীদের ঘরে ঢুকতেই মিস্ বিয়ান্দকার বললেন, প্লিজ গো ইন।

দরজা খুলে ঢুকতেই এম-ডি বললেন, গুড আফটারনুন ঋদ্ধি। হ্যাড আ নাইস্ হলিডে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

আমাদের এম-ডির দেশ কোথায় জানি না। এম-ডি-দের দেশ কোথায়? আঞ্চলিক ভাষা কি? এসব অবান্তর। রামদের মত এম-ডি-রাও একটা আলাদা শ্রেণী। আ ক্লাস্ বাই দেমসেল্ভস্। ওঁরা ইংরিজী ছাড়া কথা বলেন না। প্রথম তিন মিনিট অক্সোনিয়ান্ এ্যাক্সেন্টে ইংরিজী বলেন, কাঁধ শ্রাগ করেন, পাইপ কি সিগার নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। পরক্ষণেই হরিয়ানা, রাজস্থান, মুজাফ্ফরপুর কি বাঁকুড়া ঢুকে পড়ে তাঁদের বহু-চেষ্টা-লব্ধ অক্সোনিয়ান্ উচ্চারণে। এঁরা অনেকেই সকালে গলফ্ খেলেন, দুপুরে ক্লাবে অথবা বাড়িতে লাঞ্চে আসেন। প্রতি রাতে পার্টিতে যান।

এঁদের মুখ দেখা যায় না প্রায়শঃই। এঁদের এয়ার-কণ্ডিশানড গাড়ির পেছন থেকে ফুল-হাতা শার্টের ডান হাত এবং হাতের

কাফ-লিংকস্টুকু দেখা যায় শুধু। ওঁদের আড়ম্বর, ওঁদের কার্পেটেড চেম্বার এবং ওঁদের টুপী-পরা ভাবলেশহীন ড্রাইভার বেয়ারাদের দ্বারা ওঁরা পরিবৃত না থাকলে ওঁদের অন্য যে-কোনো সাধারণ মানুষ বলে ভুল হতে পারে। সেইজন্যেই সর্বক্ষণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকেন ওঁরা।

আসলে, রামদের সঙ্গে ওঁদের খুব একটা তফাৎ নেই। রামেরও যে-কটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, ওঁদেরও তাই। তফাৎটা এই-ই যে ওঁদের বৈভব ছিল এবং আছে। রামের নেই। ওঁরা এ বি সি ডি শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ভালো স্কুলে। বিদেশে গিয়ে, কাটা-পাঁঠার পশ্চাৎদেশে যেমন করপোরেশানের ছাপ থাকে, তেমন নিজেদের পশ্চাৎদেশে কিছু ছাপও মারিয়ে এসেছিলেন।

এম-ডি ডানহিল্ সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাভ আ গ্রাস।

এই সৌজন্যের মধ্যে ভদ্রতা যতটা না ছিল, ধন্য করার মনোবৃত্তি ছিল তার চেয়ে বেশি।

ওঁর পেছনেই একটা ছোট্ট সেলার। আজ শুক্রবার। উনি নিশ্চয়ই কোনো পার্টিতে যাবেন মেমসাহেবকে নিয়ে, তাই এখন কিছু খাচ্ছেন না। তা না-হলে সন্ধ্যার দিকে অফিসে থাকলে উনি হুইস্কী সিপ্ করেন একটু একটু করে। জনিওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল ছাড়া কিছুই খান না উনি। শুনেছি, রয়্যাল স্যালুট দিলেও প্রত্যাখ্যান করেন। এও আরেকরকম বিশেষ শ্রেণী-সচেতনতা। উনি যে অন্য এম-ডিদের মত নন, এম-ডিদের ক্লাসেও উনি যে অলটুগেদার এক ডিফারেন্ট ক্লাসের তা তাঁর ছোট-বড় ব্যবহারে, ম্যানারিজ্‌মে এবং জীবনযাত্রায় প্রাঞ্জলভাবে প্রতিভাত হয়। উনি হচ্ছেন আ কিং

এমংগষ্ট এম-ডিজ্।

আমার ইমিডিয়েট বস্ এস-ডি, মানে সেলস ডিরেক্টরও ঘরে বসেছিলেন। উনি স্কুল ফাইন্যাল অবধি পড়েছিলেন। ওঁর স্কুলের নামটা কেউ জানে না, কারণ স্কুলটার কৌলীন্য ছিলো না। হি ওজ ওয়ান অফ দোজ গাইজ হু গ্রু উইথ্ দা অরগানাইজেশান্। ব্যবহারিক জগতে প্রয়োজনীয়তার অনেকানেক গুণ ছিল এস-ডির। তার মধ্যে সঠিক ছিদ্রে সঠিক তৈল সিঞ্চন করার দেবদুর্লভ ক্ষমতা অন্যতম। মবিলের ফুটোয় পেট্রল ঢালার ভুল তিনি কখনও করেননি।

এম-ডি আবার বললেন, কি খাবে ঋদ্ধি? কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক?

আমি বললাম, নো স্যার! নাথিং। থ্যাঙ্ক উ্য।

আমি এখনও ধাওয়ানের ক্লাসে উঠতে পারিনি। হয়ত পারব; সময় নেবে। ওঠা উচিত আমার। যারা মাউন্টেনীয়ার, তারা প্রথমেই চুড়োর দিকে তাকায় না। তাকালে ওঠাই যায় না। পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে ওঠে তারা। এণ্ড দে ফাইণ্ড দেমসেলভস্ এট দ্য পীক্ ইন ওয়ান্ ফাইন মর্নিং। এণ্ড হোয়াট আ ফাইন মর্নিং ইউ মাস্ট বী।

এম-ডির জ্যাকেটটা হ্যাঙারে ঝোলানো আছে। গোলাপী আর সাদা স্ট্রাইপের একটি শার্ট। গোলাপী পাথরের কাফ্-লিংকস্ আর সাদা ব্রড টাই। জ্যাকেটের পকেটে ম্যাচ করা সাদা রুমাল মাথা উঁচু করে আছে, গায়ে ব্রুটের গন্ধ। এ্যামেরিকান পারফ্যুম 'ব্রুট ফর মেন'। অনেকেই ব্রুট, পারফ্যুম ব্যতিরেকেই?

এম-ডি উঁচু, ব্রাউন, রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে এস-ডির দিকে ঘুরলেন। অমিতাভ বচ্চনের মত হাসলেন একটু।

এম-ডির চেহারাটা ভাল। অনেকটা লম্বা, কাঁচা-পাকা পুরুষ্টু সাইডবার্নস। গলফ্ খেলে খেলে ও স্কটল্যাণ্ডের জল খেয়ে খেয়ে সান্‌ট্যানড্ লালটু চেহারা; রামের মত রাস্টিক এবং কুৎসিত নয়।

এস-ডিকে বললেন, হু উইল বেল দা ক্যাট, দিলু?

এস-ডিও হাসলেন, ডিসআর্মি স্মাইল। আমার দিকে ফিরলেন। তারপর কাঁধ শ্রাগ করে বললেন, নাউ টু বিজনেস্।

দারুণ শ্রাগ্ করেন এস-ডি। আয়নার সামনে অনেক প্র্যাকটিস্ করেছেন।

আমি উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলাম।

এম-ডি ডানদিকের ড্রয়ার থেকে তিন কপি টাইপ্‌ড কনট্রাকট ফর্ম, ফিল-আপ করা, আমার দিকে এগিয়ে দিলেন; বললেন, তুমি সই কর, আমিও সই করছি, ভালো করে দেখে নিও। সেদিন যা যা কথা হয়েছিল, সেরকমই করা হয়েছে।

আমি সই করে ওটা ওঁকে দিলাম, উনি টেবিলের ডানদিকে রাখলেন।

তারপর কেউ কোনো কথা বললেন না। সেন্ট্রাল এয়ার কণ্ডি-শানিং-এর ডাক্ট্ থেকে ফিস্‌ফিস্ করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল।

এস-ডি অনেকক্ষণ পর বললেন, ঋদ্ধি, তোমার মেসোমশাই এম-পি, তাই না?

আমি চম্‌কে উঠলাম। ভীষণ চম্‌কে উঠলাম।

বললাম, হ্যাঁ। তারপর বললাম, কিন্তু কেন?

তাঁর কাছে আমাদের একটা কাজ আছে। খুবই জরুরী কাজ। ঠিক তাঁর কাছে নয়, তবে যাঁর কাছে তিনি তোমার মেসো-মশাইয়ের কথা ফেলতে পারবেন না। এম-ডি বললেন।

ওঃ। আমি বললাম।

এম-ডি ড্রয়ার থেকে একটা প্লেনের টিকিট টেবিলে রেখে কাঁচের উপর দিয়ে ঠেলে দিলেন আমার দিকে। বললেন, পাঁচ তারিখের টিকিট। এয়ার-বাসের। ওবেরয় ইন্টারকন্টিনেন্টালে বুকিং করা আছে। তোমার মেসোমশাই উইল বী ইন দ্য ক্যাপিটাল অন দ্য ফিফ্‌থ। উই হ্যাভ অলরেডী চেকড্‌ অন দ্যাট।

তারপর একটা মোটা খাম বের করলেন ড্রয়ার থেকে। বললেন ঃ এর মধ্যে দশ হাজার টাকা আছে। আশিটা একশ' টাকার নোট। ছত্রিশটা পঞ্চাশ টাকার আর দুশো টাকা স্মলার ডিনোমিনেশানে। দিস ইজ ফর ইওর স্পেণ্ডিং।

বলেই, ইণ্টারকম্‌ তুলে ফিনান্স ডিরেকটরের সঙ্গে কথা বললেন, পালিত, থ্যাঙ্ক ট্য ফর দ্য এনভেলাপ্‌। ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইট সামহাউ। আই ওণ্ট অ্যাকাউণ্ট ফর ইট! ওকে?

তারপর এম-ডি আমাকে বললেন, এর হিসেব চাইব না আমরা। এটা শুধু তোমার মেসোকে গুড-হিউমারে রাখার জন্যে। যার সঙ্গে আমাদের কাজ, তিনি এ্যাস্ট্রনমিতে বিশ্বাস করেন। এই খামে সে কাজ হবে না। তাঁকে আমরাই হ্যাণ্ডল্‌ করব। তুমি শুধু তোমার মেসোমশাইকে দিয়ে তাঁকে একটু বলিয়ে দেবে এবং নেকস্‌ট্‌ উইকে আমার জন্যে একটা ফার্ম-এ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে আসবে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম এম-ডির দিকে।

উনি বললেন, তুমি ব্যবসার জগতে নতুন। তোমার একটু ব্রিফিং দরকার।

তারপর একটু চুপ করে থেকে সিগারেটটা কাট্‌গ্লাসের এ্যাসট্রেতে গুঁজে বললেন, ঋদ্ধি! এই দেশটার নাম ভারতবর্ষ। এখানে যা

কিছু ঘটে, সবই জনগণের ভালোর জন্যে। ব্যাঙ্ক্ ন্যাশানেলাইজেশন, কলিয়ারী ন্যাশানেলাইজেশন থেকে তোমার মেসোমশাইয়ের এম-পি হওয়া ; আমাদের কোম্পানীতে তোমার জয়েন করা সবই···

চেয়ারটা রক্ করতে করতে এম-ডি বললেন, যা আমরা করছি তাও জনগণের ভালোরই জন্যে। এইভাবে চালালেই এখন এদেশে ব্যবসা চলে ; না চালালে চলে না। আমাদের কোনো চয়েস নেই। আমাদের এমপ্লয়মেণ্টে সাড়ে চার হাজার লোক আছে। ব্যবসা না চালালে তারা বেকার হবে। আমরাও হবো। তুমি জানো যে, আমরা প্রফেশানাল ম্যানেজারস্। কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার আমরা নই।

তারপর বললেন, যেভাবে এদেশে অন্য সকলে, আমাদের কমপিটিটাররা ব্যবসা চালাচ্ছে ; সেভাবেই আমাদেরও চালাতে হবে টিঁকে থাকতে হলে।

আমি চুপ করে মুখ নীচু করে বসে থাকলাম।

এম-ডি বললেন, লুক ! ঋদ্ধি ! ট্রাই টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। কোম্পানী বন্ধ হলে এমপ্লয়ীরা না খেয়ে থাকবে। গভর্নমেণ্ট সিক্ ইণ্ডাস্ট্রি হিসাবে এই কোম্পানী নিয়ে নিলে তাদের অবশ্য ভালোই। কাজ না করেই মাইনে পাবে। কিন্তু তোমার-আমার এবং এদেশের হাজার হাজার লোকের দেওয়া ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা এক একটা সিক ইণ্ডাস্ট্রির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে। প্রতি দিনই যাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে। আমরা যা করছি, তা গ্রেটার গুড অফ দ্য কোম্পানীর জন্যে ; দেশের জন্যে। দেশে যতটুকু জেনারশান অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে ; সেভিংস হচ্ছে, তা প্রাইভেট সেক্টরেই হচ্ছে। বিশ্বাস করো, আমরা নিরুপায়। আমাদের সত্যিই কোনোই চয়েস্ নেই।

আমাদের এই কাজটা তোমাকে করতেই হবে ঋদ্ধি!

কিন্তু; আমি বললাম।

তারপর কি বলব ভেবে না পেয়ে আবার বললাম, আমার মেসোর সঙ্গে আমার টার্মস একেবারেই ভালো না।

এম-ডি বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হাসলেন। বললেন, ডোণ্ট্ বী চাইল্ডীশ! পার্সোন্যাল টার্মস্ ইজ ইমম্যেটিরীয়াল। টাকার চেয়ে বড় আত্মীয় সংসারে আর কেউই নেই। আসক্ হিম ওপেনলি। আমাদের খবর যে, তোমার মেসোমশাই, তোমার মাসীমার ভাষায় গ্যা ল্যাম্ব্। ইফ হি ওয়াণ্টস মানি ওই উইল পে ইট। ইফ হি ওয়াণ্টস উইমেন, উই উইল এ্যারেঞ্জ ফর ইট এ্যাজ ওয়েল। নো প্রোবলেম্। উই হ্যাড টু ডু ইট বিফোর।

ওয়েল···বেগারস আর নো চুজারস্।

তারপর বললেন, বাট আই অ্যাম শিওর ছাট ইফ্ হি টেকস্ মানি, হি উইল ওয়াণ্ট ইট ইন ক্যাশ এণ্ড ইন আন-অ্যাকাউণ্টেড-ফর ক্যাশ। এণ্ড দেয়ারস্ নাথিং রং ইন ইট। ইফ দ্য জব ইজ ডান, ফেয়ার এনাফ্। উই ওণ্ট গ্রাজ।

এস-ডি বললেন, ঋদ্ধি, তোমার এগ্রিমেণ্টটা রেডি হয়ে আছে। তুমি দিল্লী থেকে ফিরে এসেই সেটা হাতে পাবে—এম-ডি সই করে দেবেন। ইটস্ আ ডীল্।

তারপর নিজের আঙুলের মধ্যে ক্রশ-এর কলমটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে আমার দিকে চেয়ে লজ্জিত মুখে বললেন, উই কুডন্ট কেয়ারলেস্। আমাদের ব্যবসা করে খেতে হয়।

আমি বললাম, আপনারা বোধহয় মিসইনফর্মড হয়েছেন। আমার সঙ্গে আমার মেসোর ঝগড়া।

ওঁরা দুজনে আকাশ থেকে পড়লেন।

বললেন, বল্লো কি? স্ট্রেঞ্জ!

তারপর এস-ডি রুক্ষগলায় বললেন, তাহলে মিথ্যে কথা বলে তোমার চাকরীতে ঢোকা উচিত ছিলো না।

আমি একটা ধাক্কা খেলাম। বললাম, মিথ্যে কথা? আমি?

এস-ডি বললেন, তোমার জানা দরকার যে, তোমার মামা এবং মা মিস্টার মুখার্জীকে দিয়ে এম-ডিকে বলিয়েছিলেন। তোমাকে আমরা দিল্লীর লিয়াজোঁ কাজের জন্যেই নিয়েছি। এ্যাপয়েন্টমেন্টের রিয়্যাল নেচারটাকে ক্যামোফ্লেজ করে রাখতে হয়েছিল। যাতে ব্যাপারটা অন্যান্যদের কাছে এ্যাপারেন্ট না হয়। ইউ আর ওয়ান অফ দ্য ফিউ হুম উই হ্যাভ টেকন ইনটু কনফিডেন্স। উই হোপ, উ্য ওন্ট লেট আজ ডাউন। কি হে? আমাদের ডুবিও না। উই আর ইন দ্য সেম বোট ব্রাদার। ইফ উ্য রক্ দ্য ওয়ান এণ্ড, উ্য আর গোয়িং টু রক্ দ্য আদার।

আমি তবু চুপ করে আছি দেখে, হঠাৎ কলমটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে এস-ডি বললেন, ব্যাপারটা ভেরী সিম্পল্ ঋদ্ধি! সোজা কথা সোজা করে বলা ভাল। তোমার মত লক্ষ লক্ষ অর্ডিনারী এম-এ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। হোয়াট্ ডু উ্য থিংক ইওর কোয়ালিফিকেশনস আর্? ইওর মেসো এ্যাপার্ট?

ঐ ঠাণ্ডা ঘরেও বসে ঘেমে উঠলাম। নতুন চাকরি পেয়ে কেনা ভালো জামা, গলায় টাইট করে বাঁধা চওড়া ক্রিজলেস টাই; দামী চাকরের পোশাক পরে দম বন্ধ লাগছিলো আমার।

মুখ নীচু করে রইলাম আমি।

বললাম, মিস্টার মুখার্জী কে?

এস-ডি বাংলায় বললেন, ন্যাকামি করো না। তোমার ফিঁয়াসে রাই-এর বাবা!

এম-ডি বললেন, দিলু, ডোণ্ট বী রুড টু হিম্। ডোণ্ট আপসেট্ ঋদ্ধি! হি ইজ আ নাইস বয়। হি মে এজ ওয়েল বী ইন্নোসেণ্ট্।

বলেই বললেন, ঋদ্ধি, আমরা বুঝতে পারছি যে, তুমি এসবের কিছুই জানতে না, কিন্তু তুমি আমাদের কাজটা ইচ্ছে করলেই করে দিতে পারো, এবং ভবিষ্যতেও করতে পারবে, এবং তার বদলে তুমি তোমার সারাজীবনের ক্যারিয়ার পাচ্ছো। ইটস্ আ স্কোয়ার ডীল্। এভরি ডেবিট হ্যাজ আ ক্রেডিট। ইন দিজ ডেজ্ উ্য মাস্ট নো এলিমেণ্টারী এ্যাকাউন্টেন্সী। বিকজ এ্যাকাউন্টেন্সী গোজ টু দ্য ভেরী রুট্ অফ আওয়ার লাইভস্। ডেবিট হলেই ক্রেডিট হবে। হতে বাধ্য।

এস-ডি বললেন, কি ভাবছ তুমি ঋদ্ধি?

আমি বললাম, আমাকে একটু সময় দিন। একটু ভেবে দেখতে দিন।

এম-ডি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার কাছে এলেন। বললেন, ফেয়ার এনাফ্। তুমি আজকের দিনটা ভেবে ছাখো। কালকে তুমি সাড়ে আটটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করো। নো এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ইজ নীডেড। বাড়িতে। ঠিকানাটা লিখে নাও, উডল্যাণ্ডস্ নার্সিং হোমের রাস্তাটা, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পরে। হ্যাভ ব্রেকফাস্ট উইথ মী।

তারপর বললেন, ওকে? এখন উ্য আর ফ্রী টু গো।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। বেরিয়েই তক্ষুনি মিনি-বাস না ধরে একটু হাঁটতে লাগলাম, ভীড়ে গা মিশিয়ে। একটু ভাবা দরকার। মাথাটা বড় ভারী হয়ে আছে। কান ছুটো গরম।

বড় অপমান। জ্বালা করছে সারা শরীর। সরিৎ-মেসো! রাই, মা; বড়মামা!

না, আমার কিছু বলার নেই। আমার লজ্জাও নেই। একজন অর্ডিনারী এম-এ। চাকরি তাহলে হতোই না!

কারো সঙ্গে যে পরামর্শ করব এমন কেউই নেই আমার এই মুহূর্তে। রাই ফিরেছে কিনা জানি না। ফিরলেও আমি আর কোনো যোগাযোগ রাখতে চাই না ওর সঙ্গে। সবকিছুরই সীমা থাকে। ও সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছিল। দশেবার দিন রাতে সে ধাওয়ানের বাড়িই থেকে গেল। নবমীর দিনও ফিরল রাত ছুটোয়, ড্রাঙ্ক্ হয়ে। ডেড্ ড্রাঙ্ক।

একটা বড় স্টেশনারী দোকান পড়ল পথে। মদও আছে দেখলাম। হঠাৎই ঢুকলাম। জিগ্যেস করলাম, জনি-ওয়াকার ব্ল্যাক-লেবেল আছে?

দোকানী আমার দিকে তাকাল।

বললাম, কত দাম?

সাড়ে পাঁচশ! সেলস্ ট্যাক্স চেপেছে নতুন।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঘেমো ঘাড় সমান লম্বা-চুলওয়ালা একটি সুখী সুখী দামড়া ছেলে তার নেকু-নেকু গার্ল ফ্রেণ্ডকে চকোলেট কিনে দিচ্ছিল। ছেলেটির কানের কাছে মুখ নিয়ে মেয়েটি কি যেন বলল ফিস ফিস করে।

ছেলেটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, বেইবী, ডোণ্ট বী ক্রেইজী!

সাড়ে পাঁচশ?

ক্রেইজী!

বেরিয়ে এলাম। আমারও সাধ হয়েছিল হুইস্কী খেয়ে আমি

খাওয়ান কি আমার এম-ডির পর্যায়ে উঠি। হলো না। সামর্থ্য নেই। ভাবলাম, হেটে পার্ক স্ট্রীট অবধি যাই। সেখানে অলিম্পিয়াতে বসে খাবো। খেলে কী হয় দেখবো। ব্রেইন খুলে যাবে? সাহস বেড়ে যাবে? ভয় চলে যাবে? সরিৎ মেসোকে খুন করতে পারবো? রাইকে রেপ্ করতে পারবো?

মদ খেলে কি কি করতে পারবো তা আমি দেখতে চাই।

পার্ক স্ট্রীটে হাঁটতে ভারী ভাল লাগে! মনেই হয় না ভারতবর্ষে আছি। বিশ্বাস হয় না যে, যে-সব দামড়ারা সঙ্গে নেকু পুষু মুনু মেয়েদের নিয়ে এখানে ঘোরাঘুরি করে তারা এবং আমার চেনা রাম, দশরথ, রামকৃষ্ণ, নবীন মুহুরী, রাম সিং ড্রাইভার, রাম-বেয়ারা, রামবাহাদুর ফৌজী, সব একই দেশের লোক!

আমার হঠাৎ সুপার কথা মনে পড়ল। আজকে সুপা কাছে থাকলে ওর সঙ্গে পরামর্শ করতাম। কিন্তু পরামর্শর কিছু কি আছে? এটা বেঁচে থাকা না-থাকার প্রশ্ন। বেঁচে থাকা মানে, দশরথের মত বেঁচে থাকা নয়, ছোটবেলা থেকে আমি যে ন্যূনতম আরামে অভ্যস্ত আছি (সেটা কিছু বাড়াবাড়ি রকমের নয়, আমার মতে), সেইরকম-ভাবে বেঁচে থাকা। উন্নতি হবে না। হয়ত চাকরিটাও চলে যাবে। কোম্পানীব দিল্লীর কাজটা না করতে পারলে ঐ অসম্মানের মধ্যে ওখানে কাজ করাও সম্ভব হবে না।

ইয়েস্! আমি একজন অর্ডিনারী এম-এ। এস-ডি যা বলেছেন তা ঠিক। মুরুব্বী না থাকলে আমিও হয়ত জামার কলারের নীচে রুমাল গুঁজে মুখ নীচু করে সুবীরদার মত এখন তিনশ টাকার লেজার-কীপারের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতাম। এখন আমার পরনে ভালো কাপড়ের ফ্লেয়ার, টেরী-কটের সাদা—ছাই স্ট্রাইপের শার্ট

আর ছাই-রঙা টাই। একজন শানদার খাবসুরৎ চাকর আমি। হস্তিনী শেঠানীর প্রিয় যুবক গৃহভৃত্যের মত।

পর পর যানবাহন চলে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। প্রাইভেট গাড়ি, ইম্পোর্টেড, এয়ারকণ্ডিশানড্।

ক্লাস ওয়ান, গ্রেড ওয়ান।

প্রাইভেট গাড়ি ; সাধারণ।

ক্লাস ওয়ান্, গ্রেড টু।

পুরো ট্যাক্সি—একজন লোক একা বসে আছেন পিছনের সীটে, বাঁ-হাতটা জানলায় রেখে, গর্বিত ভঙ্গিতে স্টপেজে-দাঁড়ানো হাজার হাজার লোকেদের দিকে অনুকম্পার চোখে চেয়ে: ক্লাস টু, ডাইরেক্ট্ রিক্রুট।

শেয়ার-ট্যাক্সি। গাদাগাদি করে ঘর্মাক্ত পাঁচজন বসেছেন। ড্রাই-ভারকে নিয়ে ছ'জন। এক টাকা পঞ্চাশ—অফিস থেকে বাড়ি। ক্লাস টু, গ্রেড টু।

মিনি-বাস ? আশি পয়সা ? ক্লাস থ্রী।

লিমিটেড স্টপেজ—এল্-নাইন—আলো জ্বলা বাস ? ক্লাস ফোর।

তারপরই জনগণের বড় আপন, ডিজেলের ধোঁয়া আর বিষে পৃথিবী অন্ধকার করা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত আর্তনাদ করতে করতে আধুনিক ভারতীয়র মত ন্যুব্জ-হয়ে-এগোনো স্টেট বাস ; প্রাইভেট বাস। আর শ্লথগতি, কেরানী-ঘুম-পাড়ানো-দোল-দোলানো-ট্রাম। ক্লাস ফাইভ্।

আজ রমুকাকার বাড়ির দেওয়ালে ছেলেগুলো সকালে লিখেছিলো : শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলুন।

গড়বে? যদি পারো ত গড়ো না ভাই! পারলে ত সকলের মঙ্গলই হয়। সত্যিই গড়তে চাও? না শুধু ভোটই চাও?

কিন্তু পারবে কি?

প্রথমে আনাড়ীর মত ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়ে, শেষে অনেকক্ষণই অলিম্পিয়ায় বসে ছিলাম। যখন বাড়িতে পৌঁছলাম ট্যাক্সি করে—তখন রাত দশটা। শরীর অপ্রকৃতিস্থ; মস্তিষ্ক অবশ।

বাড়ির গেটে রাম বসেছিল।

আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, এত দেরী করলে কেন? বাড়িতে কেউ নেই। তোমার জন্যেই বসে আছি—তোমার সব চিন্তা এখন আমার। দেরী হবে, তা একটা ফোন করলে না কেন?

আমি কথা না বলে ঘরে গেলাম, জামা-টাই খুললাম। টাইয়ের নট্‌টা অলিম্পিয়াতেই আলগা করেছিলাম। দাসত্বের ফাঁস লাগছে।

হুইস্কী খেলে মাথা খোলে, ব্রেইন শার্প হয়। ধাওয়ান, আমার এম-ডি আরো কত সব বিখ্যাত বিখ্যাত সাকসেস্‌ফুল লোকেরা রোজ হুইস্কী খান। ভাবছি, এবার থেকে খাবো মাঝে মধ্যে।

রাম আমার জামাটা তুলে রাখতে গিয়ে আমার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে বলল, কিসের গন্ধ পাচ্ছি? একটা খারাপ গন্ধ।

তারপরই আমার মুখের দিকে এবং চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, হায় আমার কপাল! এই গুণ হলো শেষকালে! হায় রাম! আমি কি করব? তারপর কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, আমাকে তুমি ছুটি দিয়ে দাও, আমি চলে যাবো। চোখের সামনে এভাবে নষ্ট হতে দেখতে পারবো না তোমাকে।

আমি মনে মনে বললাম, কে আর নষ্ট হতে চায় রে স্বেচ্ছায় রাম? নষ্ট হওয়া বড় কষ্টের। শক্তি চাটুজ্যের লাইন? এখন মনে

পড়ছে না; কিছুই মনে পড়ছে না। চারদিকে রাবণের ভীড়। রাবণেরা রামদের ত নষ্ট করবেই!

রাম বলল, শীগগিরি চান করে নাও, আমি ঠাকুরকে বলে খাবার ঠিক করছি। উপরে এসো, খাবার ঘরে।

আমি বললাম, আমার ঘরেই খাবার আন। আমি উপরে যাবো না।

রাম দাঁড়িয়ে থাকল।

আমার কিছু ভালো লাগছে না। কাউকে দেখতে ভালো লাগে না। লোকজন, গোলমাল, প্লেট-চামচের শব্দ, আদর-আপ্যায়ন কিছুই ভালো লাগে না। আমি কারু মুখ দেখতে চাই না, কারোকে আমার মুখ দেখাতেও চাই না।

রামকে বললাম, আজ থেকে মেঝেতে এখানেই খাবো আমি।

রাম বলল, হুঁ, তুমি কি আমাদের মত ছোটলোক যে, মাটিতে বসে খাবে?

আমি বললাম, বেশি কথা বলবি না। বেশি কথা বললে থাপ্পড় খাবি। যা বলছি তাই-ই কর। তাই-ই করবি এখন থেকে।

মনে মনে বললাম, আমার মনিবরা কিন্তু কখনও থাপ্পড় মারবে না রে আমাকে। ঠাণ্ডা ঘরে বসে, ঠাণ্ডা হাসি হেসে, ওরা আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেবে। আমাকে আত্মসম্মানজ্ঞানহীন করে দেবে। ভালো ফ্ল্যাট দেবে; নতুন গাড়ি, টুপী-পরা ড্রাইভার। আমাকে ইচ্ছেমত তুলবে নিজেদের প্রয়োজনে আবার ইচ্ছেমত ফেলবে প্রয়োজন ফুরোলে।

রাম থাপ্পড় খায়, তবুও কাজ করে; কারণ কাজ না করলে

খেতে পাবে না। সীতা ও লব্ না খেয়ে থাকবে, তার বৃদ্ধ বাবা দশরথ না খেয়ে থাকবে।

অপমান সয়ে, অসম্মান বয়ে আমিও কাজ করব। কারণ মোটা-মুটি ভালো-থাকা, ভালো খাওয়া এবং সমাজের একজন এন্‌টিটি হবার উচ্চাশা আছে আমার। আফ্‌টার অল্ আমি ত রামের মত করে বাঁচতে পারি না। আমি আমার শ্রেণীব।

১১

সকালবেলা চোখ চাইতেই দেখি রাম দাঁড়িয়ে দরজার সামনে। আমার গায়ে বেশ জ্বর। তাকাতে পারছি না।

বললাম, কি হলো?

ও বলল, একটা চিঠি আছে। আর কাল সন্ধ্যেবেলা রিণা দিদিমণি ফোন করেছিল।

আমি বললাম, রিণা দিদিমণি কে?

রাম বলল, গুমানি থেকে এসেছে, রিণা দিদিমণি।

তখনই আমার সন্দেহ হলো। হয়তো রাই। ডুমিয়াকে গুমানি করে ফেলাটা ওর পক্ষে স্বাভাবিক। এতদিনে ওর ইডিয়সীর প্যাটার্নটা মোটামুটি ধরে ফেলেছি। মীন, মিডিয়ান ও মোড কষে কাছাকাছি চলে যেতে পারি।

চা খেতে খেতে আমি বললাম, নম্বরটা ডাক।

কত নম্বর?

ওকে নম্বরটা বললাম।

ও কিছুক্ষণ ফোনটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করে বলল, নাঃ! ইংলিশ চালিচি।

আমি রিসিভার তুলে দেখলাম, পরিষ্কার ডায়াল টোন আসছে।

ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আমি ডায়াল করলাম।

রাই-ই ধরল।

বিরক্তির গলায় বলল, কি ব্যাপার?

কেন? আমি গম্ভীর গলায় বললাম।

ও বলল, ওরকম না বলে-কয়ে চলে আসার মানে? স্থপা বলছিল, দশেরার রাতেও তুমি বারান্দায় বসে ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলে। কাউকে না বলে-কয়ে ওভাবে স্টাণ্ট দিয়ে, পরদিন সাত-সকালে চলে না-আসলেই হতো না? তুমি যে এরকম কনসার্ভেটিভ তা আমার জানা ছিলো না।

আমি বললাম, যাদের কনসার্ভ করার কিছুমাত্র থাকে তারাই কম-বেশি কনসার্ভেটিভ হয় রাই! তুমি বুঝবে না।

ও বলল, বিন্না, একটা ইয়ং ইনোসেন্ট ছেলে; সে তোমাকে দেখে স্তম্ভিত!

বিন্না কে? আমি বললাম।

ও বলল, বিন্না; ধাওয়ানের ফারস্ট নেম!

ও! আমি বললাম।

রাই বলল, লজ্জায় মাথা কাটা যায়। শ্রীও বা কি ভাবল।

আমি বললাম, লজ্জা তোমার আছে তাহলে?

তারপর বললাম, তোমাদের এনগেজমেণ্ট কি হয়ে গেছে?

রাই একটু চুপ করে থাকল।

তারপর ঝাঁজের সঙ্গে বলল, না হলেও হবে শীগগিরি। তোমার

দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। শ্রী আর কিকির এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে।

খুব আনন্দের কথা। আমি বললাম। তারপর বললাম, আর কিছু বলবে?

ও বলল, না! শুধু এইটুকুই বলব যে, তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ভুল করেছিলাম। ইউ ডু নট বিলঙ টু মাই ক্লাস।

আমি বললাম, ঠিকই বলেছো। এণ্ড···ইউ ডু নট বিলঙ টু মাই ক্লাস আইদার।

বলেই, টকাস্ করে রিসিভার রেখে দিলাম।

বাম একটু পবে এসে বলল, একটা চিঠি এসেছিল কাল। কাল ত যে অবস্থায় এলে, চিঠি পড়বে কি!

চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিলাম। লেখাটা অপরিচিত। তবে মেয়েলী লেখা। খামটা হাল্‌কা। খুলছি, রাম বলল, কাল আমারও চিঠি এসেছে দেশ থেকে, বাবা, সীতা আর লবকে নিয়ে আসছে কাল ভোরে।

কেন? কি হয়েছে? আমি শুধোলাম।

ও বলল, লবের আর সীতার কী অসুখ হয়েছে। ওখানের ডাক্তার বলেছে শহরে নিয়ে দেখাতে।

আমি বললাম, এ বাড়িটা কি আমার? মামা নেই, মামী নেই, ওরা না বলে-কয়ে চলে আসছে কিরকম?

তাই-ই ত কথা। আমি ত সেই কথাই ভাবছি। ছোটলোক, সব ছোটলোক। কোনো আক্কেল আছে ওদের! মোর বাপ্‌টার?

চিঠিটা খুলতেই দেখি সুপার লেখা চিঠি। পাঁচদিন আগের তারিখ দেওয়া। "শুক্রবার সকালে কোলকাতায় পৌঁছব। মামা-

বাড়িতে ফোন নেই। পাশের বাড়ি থেকে তোমাকে সন্ধ্যাবেলায় ফোন করব। শনিবার কি করছ? মামাবাড়ির ঠিকানা নীচে দিলাম। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।

আমি একাই যাচ্ছি।"

রামকে বললাম, চিঠিটা কবে এসেছে?

এই ত কাল আসল।

আমি বললাম, পাঁচদিন আগের চিঠি, কাল হতেই পারে না। তারপর খামের উপরের তারিখ দেখলাম, পরশুদিনের ছাপ আমাদের পোস্ট অফিসের। তাহলে পরশুদিন, নয়ত কাল সকালে এসেছে নিশ্চয়ই। ইডিয়টটা কোথায় ফেলে রেখেছিল।

আমি বললাম, থাপ্পড় খাবি মিথ্যুক। তারপর ভাবলাম, মিছি-মিছি নিজেরই মুখ ব্যথা। ওর গণ্ডারের চামড়া। কিছুতেই কিছু হবার নয়।

ঈস্‌স্‌, ঠিক স্নুপাই ফোন করেছিল। রাই নয়। ছিঃ ছিঃ, রাই কি ভাবল। ভাবল আমি গায়ে পড়ে ফোন করলাম ওকে। কোথায় স্নুপা আর কোথায় রাই!

এই জন্তুটাকে নিয়ে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

এমন সময় ফোন বাজল। রাম ধরল। বলল, হেল্লো···। হেল্লো···

যে ফোন করেছিল তার শনিবারের সকালের বারোটা বেজে গেল। কানের পর্দাও আস্ত থাকার কথা নয়।

রাম এসে বলল, যা তা গালাগালি দিচ্ছে ইংরিজীতে। কিছুই বুঝলাম না।

তাড়াতাড়ি ঘড়িতে তাকিয়েই দেখি ঠিক সাড়ে আটটা। নিশ্চয়ই এম-ডি।

আমি রামকে বললাম, তুই গিয়ে বলে দে, রং নাম্বার।

বলেই, রিসিভারটা টেবিলে নামিয়ে রাখ।

রাম গিয়ে বলল, রং নাম্বার ইস্টুপিড।

তারপরই শুনি বলছে, কি বললেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাদাবাবুই ত বলতে বলল।

রামও রিসিভারটা টেবলের উপর নামাল ঠক্ করে, আমার চাঁটিটাও পড়ল ওর মাথায়। অসহ্য। অসহ্য। আমার ঘাড় থেকে নামবেও না, মরবেও না এবং আমাকেও মেরে ফেলবে এই আকাটটা।

রাম উত্তেজিত হয়ে বলল, একি? তুমিই বলতে বললে রং নাম্বার—আবার তুমিই চাঁটা মারছ—তোমাকে বাবা বোঝা আমার সাধ্য নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে রিসিভারটা তুলে রাখলাম জায়গামত। যদি সুপা ফোন করে। আমার শরীরের এমন অবস্থা নেই যে, আমি বাড়ি থেকে বেরোই। বেশ জ্বর এসেছে। গায়ে অসহ্য ব্যথা। ভাবলাম, কাল নেশার ঝোঁকে সমস্ত জানালা দরজা খুলে শুয়েছিলাম। ভাল ঠাণ্ডা পড়েছে হঠাৎ কালীপূজার পর। আমার অসুখ সচরাচর করে না। কিন্তু করলে আটানব্বুই জ্বরেও বড় কাবু করে।

সুপা কি ভাবছে? অথচ রামকে যে ঠিকানা দিয়ে কোথাও পাঠাবো তারও উপায় নেই কোনো। নিজেই হারিয়ে যাবে। গত কুড়ি বছর ও আমাদের বাড়ির বাইরে এক পোস্টাপিস, কালীঘাট আর পানের দোকান ছাড়া আর কোথাও যায়নি।

একটা চিঠি লিখে রামকে বললাম, গিদাইয়া এলে এই ঠিকানাতে ওকে পাঠাবি। আমার কাছ থেকে শুনে যেন যায়।

কিন্তু দশটার পর থেকে আমার জ্বর হু হু করে বাড়তে লাগল। রাম দৌড়ে গেল আমার বন্ধু-ডাক্তারকে ডাকতে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে মাথাটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার এসে বলল, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়নি। এ অন্য জ্বর। রক্ত পরীক্ষা করতে পাঠাল। রামকে বলল, থার্মোমিটার দিতে তিন ঘণ্টা অন্তর।

রামের পক্ষে ওসব সম্ভব ছিল না। গিদাইয়া সন্ধ্যাবেলা ফিরে না আসা অবধি জ্বর নেওয়া গেল না। আমার নিজের শক্তি ছিল না যে, থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর দেখি। মাথাটায় করাত চিরছে কারা যেন। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

সকালের দিকে জ্বর একটু কমল। কিন্তু বড় দুর্বল।

রামের এক গ্রামের লোকের সঙ্গে দশরথ, সীতা ও লব এল সকালে পুঁটুলী হাতে নিয়ে। লোকটি আমাদের বাড়ির কাছেই অন্য এক বাড়িতে কাজ করে। সে চলে গেল ওদের পৌঁছে দিয়েই।

দশরথ ঘরে এলো। বলল, দাদাবাবু তোমার জন্যে পোড়পিঠা এনেছিলাম। খাবে না?

কি বলব? জ্বরাচ্ছন্ন চোখে দশরথের সৎ পবিত্র অপাপবিদ্ধ মুখে তাকিয়ে ভালো-লাগায়, কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল।

বললাম, ভালো হলেই খাবো। তোমরা আরাম করো।

সীতা—রামের বৌ, আরও বেঁটে হয়ে গেছে মনে হল। এমনিতে চার ফিট চার-পাঁচ ইঞ্চি উঁচু হবে ও। কালোও হয়েছে, সেবারে যেমন দেখেছিলাম, তার চেয়ে। লব, রামের ছোট্ট ছেলে, একটা ধাড়ী শ্রীহীন ইঁদুরের মত। অভুক্ত; অশক্ত।

সকালে যখন ডাক্তার এলো; বলল, ভোগাবে। ম্যালিগ্ন্যাণ্ট

ম্যালেরিয়া—খুব ভালো শুশ্রূষার দরকার!

তারপর ঠাকুরকে বলল, মা আর মামীমাকে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। ঠিকানাটা আমাকে দাও বেনারসের।

আমি ডাক্তারের হাত চেপে ধরলাম। বললাম, একদম নয়। ওঁদের শরীর ভালো নেই। অনেক অসুবিধা করে সকলে গেছেন। আমি ঠিক হয়ে যাবো। তুমি ত আছো। এরা আছে।

ও বলল, আমি কি বলছি তুমি ভালো হবে না? কিন্তু শুশ্রূষা ছাড়াও সময়মত ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়া চব্বিশ ঘণ্টা, পথ্য খাওয়া ঠিক সময়ে, এসব দরকার—এসব করার লোক কোথায়? ওষুধ বুঝে নেবে কে? নানারকম ওষুধ। ইনজেকশন না হয় আমিই দিয়ে যাবো। কিন্তু···

আমি বললাম, গিদাইয়া বুঝে নেবে। ও দুপুরে এলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। বুঝিয়ে দিও ওকে। প্লিজ।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে উঠে গেলো। বলল, এরকম অবুঝের মত করলে মুশকিল হবে। আবার জ্বর বাড়লেই বুঝবে—এ সাধারণ অসুখ নয়। শরীর এবং ব্রেইনের মহা ক্ষতি করে।

আমি হাসলাম। বললাম, ব্রেইন থাকলে ত ক্ষতি করবে।

সীতাকে দেখে ডাক্তার বলল, এ্যাকিউট ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সী, এ্যানিমীয়া এণ্ড হোয়াট নট্। ওকে ভালো করে মাগুর মাছ খাওয়াও। ওষুধ লিখে দিচ্ছি। লবকে দেখে বলল, এরও সেই অবস্থা। তার উপরে এর ত দেখছি জণ্ডিস্‌ও রয়েছে।

আমি বললাম, চমৎকার। হবেই। ওরা যে বেঁচে আছে এই-ই ত যথেষ্ট। বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য। যা হোক, ওষুধ পথ্য লিখে দাও।

রামকে বললাম, ড্রয়ার খুলে টাকা নিয়ে যা, ওদের ওষুধপত্র

আনা এবং ডাক্তারবাবু যেমন বলেন, খাওয়া নিয়মমত।

পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই গিদাইয়াকে আমার কাছে রেখে রাম তার গ্রাম্য ও ছোটলোক বাবাকে এবং ছোটলোক শ্বশুরের মেয়েকে নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনতে গেল। আমিই জোর করে পাঠালাম। লবকেও সঙ্গে নিয়েছে সীতা! কার কাছে রেখে যাবে?

যাবার সময় রাম বলল, তুমি একা থাকবে?

বললাম, গিদাইয়া ত আছে। তুই যা না! দেরী করছিস কেন?

ও বলল, হুঁঃ।

ও গররাজী হলো বটে, কিন্তু গেলো।

আমাকে ও অন্য কারো হাতে ছাড়তে রাজী নয়। ও একাই আমার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটাতে চায়।

বেলা বারোটার পর থেকেই জ্বরটা বাড়তে লাগলো হু হু করে। দুটো নাগাদ একেবারেই অসহ্য হল মাথার যন্ত্রণা। ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলাম আমি। গিদাইয়া কখনও আমার কাজ করেনি। ও জানে না, কি করে কি করতে হয়। আমার সাংকেতিক ভাষায় রাম অভ্যস্ত। এখন কথাও আর বলতে পারছি না। চোখ মেলতে পারছিলাম না আমি। চোখে কিছু দেখতেও পাচ্ছিলাম না। আস্তে আস্তে হুঁশ চলে গেল মনে হলো। মাথাটা কিছু আর ভাবতে পারছে না। চোখে বড়ই ভার। সারা গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আমি কি মরে যাবো? মরে যাবার আগে বোধহয় মানুষ চেতন আর অবচেতনের মধ্যে এমন করেই ভাসে, উদ্দেশ্যহীন, সময়-জ্ঞানহীন, ভাবশূন্যহীন হয়ে। কত ঘণ্টা হয়ে গেল কে জানে? কোথায় আমি?

আমার কানের কাছে কারা যেন কথা বলছিল। আমি কোথায়?

তোমরা কারা ? কে ? রাম ? এ্যাই রাম !

আমি বললাম, রাম ! ছাখ ত, আমি মরে গেছি না কি ?

রাম বলল, কই ? এই ত নিঃশ্বাস পড়ছে নাক দিয়ে।

আমি বললাম, গাধা ! শুধুই নিঃশ্বাস ফেলা আর প্রশ্বাস নেওয়া আর বেঁচে থাকার মধ্যে অনেক তফাৎ রে। অনেক তফাৎ।

দশরথ জঙ্গলের পথে হাঁটতে হাঁটতে আমাকে বলেছিল, ওদের গাঁয়ের আদ্ধেক লোকই জামা-কাপড় পরতে পায় না। একটা গামছা কিনে দু-ভাগ করে কেটে আধখানা গায়ে দেয়, আর অন্য আধখানা গায়ে জড়ায়। শীতের দিনে আগুনের সামনে বুক ও পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে ওদের বুক পিঠের চামড়া ঝলসে যায়। চৈত্র বৈশাখ মাসে এক এক পরত চামড়া উঠে যায় নাকি সাপের খোলসের মত ওদের বুক পিঠ থেকে। যে দেশের রাজধানী ফোয়ারা-ফোটা আলো-ঝলমল চোখ-ধাঁধানো দিল্লী, সেই দেশের মানুষ এরকম গরীব ! হতেই পারে না। ব্যাটা মিথ্যুক। ছোটলোকগুলো সব মিথ্যুক। বিশ্বাস করি না ঐসব বানানো গল্প।

এই স্যুটটা কোন দোকান থেকে বানিয়েছেন স্যার ?

এম-ডি হাসলেন। বললেন, বার্লিংটনস্ অফ ক্যালকাটা। এক্স-ক্লুসিভ্। থ্রু থাউজেণ্ড।

সরিৎ-মেসো কেমন আছো ? ভালো ? আমি কিন্তু তোমার কাছে যাচ্ছি না। কোনোমতেই না। তাতে আমার চাকরি থাকুক আর না-ই থাকুক—

রুমি বলেছিলো, দিস সরিৎ-মেসো ইজ আ ডার্টি পার্সন। ভেরী ইনডিসেণ্ট ইনডিভ্। শী ওয়জ রাইট। এ্যাবসলুট্‌লী।

কে ? দশরথ !

আমি জানতাম যে, ও রাস্তা পেরুতে পারবে না কোলকাতায়। দোতলা স্টেট বাসের আওয়াজ আর ধোঁয়ায় ও চমকে উঠে ভয় পাবে। আমি যেমন ওদের জঙ্গলে বাঘের ডাকে পেয়েছিলাম।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে অজ্ঞানতা।

অজ্ঞানতা থেকেই সব ভয়ের জন্ম। অজ্ঞানতার কারণেই সরিৎ মেসোদের সকলে ভয় করে।

রমুকাকা? কি বলছ তুমি? কি বলছ?

ছ্যাখো, বেশি ভয় দেখিও না। ভয় আরও বেশি দেখালে ভয় ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে যাবে তোমাদেরই বুকে। ভয়ের বাসা কাঁচের ঘরে। ঢিল পড়বে দুমদাম্। ভুলে যেও না তোমরা।

"সব কিছুরই একটা কোথাও করতে হয় তার শেষ।"—ক্ষণিকা।

শ্রী, তুমি ক্ষণিকা পড়ো নি? না?

তোমাকে অনুকম্পা।

কোথায় হাঁটছি? পার্ক স্ট্রীট! আঃ, কি আরাম—এ্যামেরিকা নাকি?

তুমি কে? শ্রী? শ্রী-ই ত! কোথায় এসেছিলে?

রাতে কক্‌টেল আছে? এ-এন জন-এ চুল ঠিক করতে এসেছিলে?

এখন কোথায় যাবে? পা পরিষ্কার করতে? পেডিকিউর! বাঃ বাঃ করো। তোমাদের সুন্দর সুন্দর পা। তোমাদের সবকিছুই সুন্দর! সুগন্ধি, নরম, কোমল; স্বপ্ন-স্বপ্ন।

স্যার! আপনি স্যার? এখানে?

এস-ডি! সেলস্ ডিরেক্টর!

আমি? এই এসেছিলুম জাপানী কনট্রাসেপটিভ্ কিনতে আর বিলিতি সিগারেট। লুক ঋদ্ধি! উ্য হ্যাভ গট টু ডু ইট। ডু ইট; অর

গো টু হেল॰।

ডু, অর ডাই। কে বলেছিলেন? গান্ধীজী!

রাই? তুমি? ভালো আছো? আমার সোনা! আমার প্রথম প্রেম! ভুল-করা প্রেম। ওয়াক্—থুঃ।

প্রেম বলে কি কিছু আছে সংসারে, রাই?

কোথায় যাচ্ছো তুমি?

ও! ধাওয়ান এসেছে বুঝি? পার্ক হোটেলে? রাতটা থাকবে? বাঃ বাঃ। জোনাথন্ ব্লক। শাব্বাশ্!

আমি টেনিস খেলে পাঞ্জাবীর মত শক্ত ফিগার করেছিলাম, কিন্তু মেকী-পাঞ্জাবী বলে জেনুইন-পাঞ্জাবী ধাওয়ানের কাছে হেরে গেলাম। জেনুইনদের কাছে মেকীরা চিরদিনই হারে; ওরিজিনালদের কাছে প্রোটোটাইপরা।

মিস্টার রূপ মুখার্জী, তেলে-বাঁশের বাঁদর, তোমার উরু-সন্ধি চিরে গিয়ে তোমার শরীর ফাঁক হয়ে যাবে একদিন। এক পা থাকবে জোনাথন ব্লকে, তোমার অন্য পা রোজমেরী ব্লকে।

আঃ, মাথায় বড় ব্যথা।

তুই কে রে ব্যাটা? ওঃ কপিলা। মজদুরদের নেতা! এ-বি-সি-ডি জানলে এদেশে তুই বড় ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট্ হতিস। নবীন মুহুরীর ডেরাতে পানমৌরী খেয়ে সকলকে ডোবালি তুই-ই! নিজে টাকা নিয়ে পকেট ভরলি, রামকৃষ্ণদের জন্যে কিছুই করলি না। তোর বিচার একদিন রামকৃষ্ণরা করবে। দেখিস, দেরী নেই।

কি করতে এসেছিলি, কপিলা?

মিটিং-এ যোগ দিতে? যারা রাজনীতি করে না তাদের কঞ্চি হাতে ভয় দেখাতে?

কি বললি? বিনা-টিকিটে ট্রেনে চড়ে কোলকাতা দেখে গেলি? টাকাও পেলি!

বেশ! বেশ!

দীপ? দীপ তুমি কেমন আছো? ব্যবসা করছ? ভালো ব্যবসা? বাঃ! আই বেগ ইওর পার্ডন? ব্যবসা ঠিক নয়; দালালী; কন ম্যানের কাজ?

ফারস্ট্ ক্লাস! নো ক্যাপিটাল রিকুয়ার্ড।

কি বলছ? তার চেয়ে ভালো হবে চালাক-চতুর সরকারী কর্মচারী হয়ে যাবে বিশেষ চাকরী দেখে? নো খাটা-খাটনী, নো লেবার, নো ক্যাপিটাল; নীট মুনাফা! কেউ মুনাফাবাজও বলবে না! তোফ্‌ফা। বাঃ বাঃ।

ঋদ্ধি! ক্যান উ্য এ্যাফোর্ড টু লেট মী ডাউন? তুমি রামকে ডোবাবে? না আমাকে ডোবাবে? উই বিলঙ টু দ্য সেম ক্লাস! আমরা একই শ্রেণীর।

রাইট উ্য ওয়্যর দীপ। তুমি ঠিকই বলেছিলে।

দাদা, এল্‌নাইন কোথায় পাবো? নিদেন পক্ষে প্রাইভেট বাস?

মশাই, পার্ক স্ট্রীটে বাস যায় না। এখানে শুধু গ্রেড ওয়ান ক্লাস ওয়ান, গ্রেড ওয়ান ক্লাস-টু, ক্লাস টু ক্লাস-ওয়ান। ওসব ক্লাস-ফোর, ক্লাস-ফাইভ এখানে নয়।

রামকৃষ্ণ? হতভাগা। ওটা কি রে তোর হাতে? নবীন মুহুরী সঙ্গে ঝগড়া মেটেনি? আরে? ওটা কি? বেলুন? ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ফুলিয়ে বলের মত করেছিস? সামনেটা ওরকম কেন?

দূর গাধা! এ জিনিস কখনও দেখিসই নি? জানিসই না? সে কি রে? তোদের জন্যেই ত এত সব ক্রিয়া-কাণ্ড। ইংরিজী ক

বিজ্ঞাপন, সুখী পরিবার ছোট পরিবার—লাল ত্রিকোণ—আর তোরাই জানিস না—বেলুন ভেবে হাতে নিয়ে খেলছিস! ওরে ইডিয়ট রে···

কি বললি?

গ্রামের মেলায় দেখেছিলি? ভেবেছিলি একরকমের বেলুন। যাঃ যাঃ!

তুমি কে? আমার মাথায় কার হাত?

মা? মা গো! কখন এলে তুমি? কোথায় চলে গেছিলে। কবে গেছিলে? কালীফস্ সিকস্ একস্-এর সঙ্গে একটু গরম জল, টেপিড; মিশিয়ে আমাকে দাও, আমি ভালো হয়ে যাবো। মনে আছে? পরীক্ষা দিতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়তাম আমি, তখন পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলে তুমি দিতে। দাও না! মা!

মা ত নও! তুমি কে গো? আমার মায়ের মতই নরম হাত তোমার। বড় স্নিগ্ধ হাত!

কে? একি? এগুলো কি দিচ্ছ কপালে? ওডিকোলন? পটি? মি কে? বড় আপনজনের মত ভালোবাসার আঙুল তোমার। মার নাম কি গো? সুপা?

সুপা? তুমি এসেছো! এতদিনে এলে? এলো-মেলো পৃথিবীতে মনের মানুষ হারিয়ে গেলে খুঁজে কি আর পাওয়া যায়? কোথায় যে লুকিয়ে ছিলে তুমি!

নাম কি গো? সুপা?

একা, একা! বড় কষ্ট, বড় কষ্ট! যে জানে, সেই-ই জানে। আমার বড় কষ্ট সুপা। অনেকরকম কষ্ট!

এসেছো যখন; তখন থাকো। লক্ষ্মীটি। চলে যেও না। আমার কাছে বসে থাকো। তোমার পাটভাঙা তাঁতের শাড়ির

বাঙ্গালী বাঙ্গালী গন্ধ পাচ্ছি আমি। তুমি আমার কাছে থাকো, আমি ভালো হয়ে যাবো; দেখো। মনে প্রাণে আমি বড্ড বাঙালী। এই আমার দোষ। তুমিও তাই। তোমার মস্ত গুণ।

ধাক্কা লাগল? কার সঙ্গে?

কে আমাকে ইতর বলল? বলল, আমার পা মাড়ালি? বলল, জানিস, আমি জাতে বামুন?

সরী, সরী, অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি কেমন বামুন গো? নাম্বুদ্রী না কাশ্মীরী না মৈথিলী না বারেন্দ্র?

তুমি কি নেহরুদের কেউ হও নাকি? আমি মজুমদার। কায়েত। জাতে ছোট।

ভাগ্যিস, রাম তোমার পা মাড়ায়নি। ও আমার চেয়েও জাতে ছোট। আর যে-ছেলেটা নবীন মুহুরীর ডেরায় রামকে জল দিয়েছিলো কিন্তু রাম যার হাতে জল খায়নি; সেই ছেলেটা রামের চেয়েও ছোট জাতের।

ওহে বামুন, বলো দেখি, তোমার চেয়েও জাতে কে বড়?

তোমার মনিব। আর তোমার গ্রামের রাজনৈতিক নেতা।

তারাই এখন শ্রেষ্ঠ।

ছোট মাসী, তোমার কি জাত? সরিৎ-মেসো না হয় বজ্জাত জানি। তুমি কি? লালন ফকির বলেছিলো 'যদি ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি হয় বিধান?' জানো?

এই যে! আরে নবীন। নবীন মুহুরী? কি করছো এখানে? নীল লুঙিটা কোথায় ফেললে? ওঃ, তুমিও সাফারি-স্যুট পরেছো? কি বললে? বীয়ার খেতে এসেছিলে। বাঃ বাঃ, কে বলে গ্রামের লোকের অবস্থা ফেরেনি? মালিকের পার্টনারশিপে এক আনা শেয়ারও

পেয়েছো? আমি ত জানতামই।

কারা উন্নতি করবে আমি চেহারা দেখেই বলতে পারি।

প্রদীপ? কি রে? এত্ব মোটা হয়ে গেছিস। তোর সেই খদ্দরের পাঞ্জাবী আর কাঁধের ঝোলাটা কখন ফেলে দিলি? কবে? চেনাই যে যায় না রে তোকে! সঙ্গে কে? মমি?

মমি! তোমার নিজের ভুরুটা কি হল?

—আজকাল এই-ই স্টাইল। আই ব্রো পেন্সিল লাগাই।

বাঃ দারুণ দেখাচ্ছে। প্রদীপ, কোথায় আছিস রে এখন? ওঃ ভুলেই ত গেছিলাম। যোধপুর পার্কে। ডিরেক্টর হয়েছিস? গল্ফ খেলিস?

তুই খেলিস না?

ময়দানের বোওলিং গ্রীণে, বোওলিং-এ মমি গতবারে লেডিজ্‌ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলো?

আরে পার্টি দে, পার্টি দে একদিন। সেলীব্রেট কর।

মিস্ বিয়ান্দকার স্পীকিং। মিঃ মজুমদার! এম-ডি ওয়াণ্টস টু স্পীক টু উ্য! আই এ্যাম পুটিং হিম অন টু উ্য…

হ্যালো, হ্যালো, একজাস্‌পোরেটিং।

আই ডোন্নো হোয়াটস রং মিঃ মজুমদার, বাট আই কাণ্ট কানেক্ট উ্য উইথ হিম। দেয়ারস্ নো কম্যুনিকেশান্।

মিস্ বিয়ান্দকার, আই নিউ, ছাট উ্য কুডনট্। উই বিলঙ টু টু ডিফারেণ্ট ক্লাসেস—উই কাণ্ট বী এভার কানেক্টেড্। ইউ নো, কম্যুনিকেশান ইজ্ দ্য বেসিক প্রবলেম্।

দশরথ কি বলছে রে?

বলছে, কোলকাতার চিড়িয়াখানার জানোয়ারগুলো সব শুকনো,

মনমরা, রোগা ; হাড়-জিরজিরে।

ছুস্‌স্‌।

আরে, এখানের সব বাঘ গলায় বক্‌লেস পরানো পোষা বাঘ। টুপী-পরা ড্রাইভার তাদের গাড়ি চালায়। তাদের মাইনে আর পারকুইজিটের মোটা গরাদ দিয়ে তাদের বাঘত্বর দফারফা করে দিয়েছে। নখ নেই ওদের, কারো দাঁত নেই, হালুম-হুলুম করে না। মামাবাড়ির কুকুর, ঘাড়ে-গর্দানে-ভিকটরের মত খালি খায় দায় আর জাঁক করে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, আর মালিকের দালালী করে।

এক কাজ কর রাম। চিড়িয়াখানা ভালো লাগেনি ত, দশরথকে তাহলে ড্যালহাউসী স্কোয়ারে নিয়ে যা। সেখানে ভরদুপুরে এমন এমন সব সাংঘাতিক জানোয়ার দেখবে না ও যে, ওর দাঁতকপাটি লেগে যাবে। ও ভেবেই পাবে না এমন সব সাংঘাতিক জানোয়ারেরা ছাড়া থাকে কি করে! তাতেও যদি মন না ভরে, তাহলে শহীদ মিনারের নীচে নিয়ে যা। ওর মন ভরে যাবে। ম্যাজিক দেখবে। শুনবে, অসংখ্য এ্যামপ্লিফায়ারের আওয়াজ হচ্ছে গাঁক গাঁক করে, কিন্তু বলা হচ্ছে না কিছুই। প্রতিশ্রুতির বন্যা বইছে প্রতিমুহূর্তে, কিন্তু রাখা হচ্ছে না একটাও। ডুবডুবারা বালি-হাঁস হওয়ার জন্যে সংগ্রাম করছে সেখানে। তোদের মত কাদাখোঁচাদের কথা ত ভাবার সময় নেই কারও। কারোরই নেই রে!

সীতা?

কি করছে?

এই রাম! সীতা কি করছে রে?

চিড়িয়াখানার ঘাসের ওপর বসে পড়েছে?

পড়বেই ত! এ্যানিমিক। বেচারী! এত কি হাঁটতে পারে?

দশরথ! ওকে মাগুর মাছ খাওয়া রে! ডাক্তারে বলেছে।

মাগুর মাছ ?

আঠারো টাকা কে জি! একি গাজনের রসিকতা করছেন বাবু ?

আরে! ছেলেটা কোথায় গেল ? লব্ ? প্রিন্স অব ওয়েলস্! রামচন্দ্রের ছেলে ? মহান গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নাগরিক!

ন্যাংটা ব্যাটা ওরাং ওটাং-এর খাঁচার সামনে হলুদ ঘাসে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে ?

কি রে সীতা ? কি কামড়াল তোকে ? পিঁপড়ে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই শহরে অনেক পিঁপড়ে আছে। ছোট ছোট, গসিপিং; পরশ্রীকাতর পিঁপড়ে। এখানের পিঁপড়েগুলো সর্বভূক! উচ্ছেও খায় এরা। বোধহয় ডায়োবেটিক পিঁপড়ে!

মিঃ মজুমদার, এম-ডি ওয়াণ্টস টু স্পীক টু উ্য।

আই এ্যাম ওয়েটিং ফর হিম এট দিস এণ্ড। হোয়াই কাণ্ট হি কাম ?

আই ডোন্নো, হি ইজ ট্রাইং ফ্র্যান্টিক্যালী টু রীচ উ্য।

আই টোল্ড উ্য মিস বিয়ান্দকার। হি কাণ্ট রীচ মি। উই বিলঙ টু টু ওয়াইডলী ডিফারেণ্ট ক্লাসেস।

সুপা! তুমি অর্ডিনারী বি-এ। আমিও অর্ডিনারী এম-এ। আমাদের মত লক্ষ লক্ষ বি-এ এম-এ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। আমরা একই শ্রেণীর লোক। তুমি কাছে থাকো, যেও না। তোমাকে আমার দরকার। তোমার আমাকে।

এই ব্যাটা দশরথ! রূপ মুখার্জি! সবাই সাবধান। সাবধান।

খাঁচার অত কাছে যাস না। জঙ্গলের কাছেও যাস না।

আরে! তুমি!

হলুদ গেঞ্জী পরা সেই সুন্দর মত ছেলেটা। যে রমুকাকার দেওয়ালে লিখেছিলো, স্রেনীহীন সমাজ গড়ে তুলুন। দিকে দিকে।

কি ভাই?

দন্ত্য স নয় তালিব্য শ। বুয়েছেন?

বুঝেছি।

রাম। এই রাম! হতভাগা। কোথায় গেলি। একটু জল দে। জল। বড় পিপাসা।

রাম। রাম রে।

হেল্লো···

তুই যে নদীর ওপারে। আমি যাব কি করে নদী পেরিয়ে তোর কাছে? তুই বরং আয়। আমি শহুরে লোক। সাঁতার জানি না। আমার হাত ধর রে রাম। এই রাম! আয়, আমরা হাতে-হাত ধরে চলি। আয়, আমরা এক ক্লাসের পোড়ো হয়ে দুজনেই পড়া বলতে না-পেরে কান ধরে এক বেঞ্চিতে দাঁড়াই। পাশাপাশি। আয়।

হ্যাল্লো, হ্যাল্লো রাম। শুনতে পাচ্ছিস? আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস তুই?

ওঃ। ভয় করছে আমার। নদীটাতে বড়ো স্রোত রে। কত বড় বড় পাথর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নদীটা।

কি বললি? নদীটা কোথা থেকে আসছে?

এর উৎসমুখ হিমালয়ে। তারপর আসমুদ্র হিমাচলের সব কটি রাজ্যের আনাচে কানাচে ঘুরে নদীটা গিয়ে পড়েছে কন্যাকুমারিকার কাছে সমুদ্রে।

রাম, তুই ত গাঁয়ের ছেলে। সাঁতার জানিস ত ভাল। আয় না, আয়; পেরিয়ে এসে আমার হাতে হাত রাখ।

কি বললি ? পারছিস না ? বড্ড স্রোত ? ভেসে যাবি তুই ?

হেল্লো…

হ্যালো। কে ? রাম ? রাম ! শুনতে পারছিস ?

হেল্লো,…হেল্লো,…ইংলিশ চালিচি…

—